# কবিকঙ্কণ মুকুন্দ

ক্ষুদিরাম দাস

# আচার্য ক্ষুদিরাম দাস জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে নিবেদন

আচার্য ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের আশি বছর পূর্তিতে তাঁর সম্বন্ধে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের লেখা "অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস" আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে। সেজন্য অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিকঙ্কন মুকুন্দ সম্বন্ধে লেখাগুলি E-Book প্রকাশ করে আমরা তা সকলের গোচরে আনতে চাই। নিম্নে অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের লেখাটি উদ্ধৃত করা হল।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয়ের বয়স আশী হল। বয়স বেড়েছে-একথা বললে সেই সঙ্গে মনে হয় একটা কর্মময় জীবন অবসানের দিকে এগোচ্ছে। তেমনি আবার আনন্দ হয় এই কথা ভেবে যে এই কর্মময় জীবন বহু সার্থকতার ভরা যার উত্তরাধিকার পেয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। ক্ষুদিরামবাবু প্রথিতযশা অধ্যাপক এবং সর্বমান্য পণ্ডিত।তাঁর কর্ম এবং কীর্তি বিস্তৃত হয়ে আছে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে এবং অন্তত ষাট বৎসর ব্যাপী সংখ্যাহীন ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যে শিক্ষাদানে । ভালো অধ্যাপকের কথা ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে ফেরে।তাঁরা হয়ে যান কিংবদন্তী। কিন্তু যে অধ্যাপক তাঁর বিচারবুদ্ধি এবং রসাস্বাদন শক্তিকে গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন, তিনি আর কিংবদন্তী থাকেন না। তিনি বেঁচে থাকেন 'আজও যারা

জন্মে নাই' সেইসব ভবিষ্যতের অনাগত পাঠকের চিত্তেও।অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস তাঁদের অন্যতম।তিনি শুধু কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন, তাঁর কিংবদন্তীতুল্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় রেখে দিয়েছেন তাঁর বইগুলিতে-রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়, চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, সমাজপ্রগতি রবীন্দ্রনাথ-বইগুলিতে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, আজ যাঁরা ষাট বা পঁয়ষট্রি বছরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন সেই সব বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যপাঠের প্রত্যক্ষ যোগ খুব কম। সেকালের বাংলার শিক্ষকরা এমন ছিলেন না।সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-আজ যারা আশী পেরিয়ে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বাংলার সঙ্গে উত্তমরূপে জানতেন সংস্কৃত।ইংরেজির কথা বলছি না,কারণ ইংরেজি সবাইকেই ভাল করে পড়তেই হত।কেউ ইংরেজিতে বেশি পণ্ডিত কেউ কম পণ্ডিত।কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবহারিকভাবে আবশ্যিক না হলেও সংস্কৃত সবাই জানতেন বলেই বোধহয় বাংলার চর্চায় তাঁরা এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে গিয়েছেন।আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে হয়। তখন বাংলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত বুঝতেও সাহায্য করত।ব্যাকরণকে খাঁটি বাংলার ব্যাকরণ করে তুলতে হবে-এই উদ্যমের ফলেও সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ আমাদের কমে গিয়েছে। বাংলার ব্যাকরণ সংস্কৃত নিয়মনীতি মেনে তৈরি হত বলে সংস্কৃত ভাষাটা আয়ত্ত করা  অপেক্ষাকৃত সহজ হত।এখন প্রত্যয়,বিভক্তি,সমাস,সন্ধি,বাক্যগঠন প্রভৃতি কোনো কিছুতেই আর আগেয় ডিসিপ্লিন মানা হয় না। এর ফলে সংস্কৃতের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় আমাদের কমে গিয়েছে।তবে কি  বাংলা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শেই লেখা হবে?তার কি নিজস্ব রীতি প্রকৃতি থাকবে না? এটা অবশ্যই বড় প্রশ্ন। এখানে তার আলোচনা অবান্তর। সংস্কৃতের প্রতি আমাদের বন্ধনের শৈথিল্যের অন্যতম কারণটুকু শুধু উল্লেখ করলাম।
যে কালে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম  ছিল, সেই কালটা শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই কালের একজন যিনি আছেন তিনি আশীতে চলছেন-তিনি অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। ক্ষুদিরামবাবুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সাহিত্যাধ্যয়ন বস্তুটা কী। পূর্বসূরীদের মতামত অন্ধের মতো বলে যাওয়া নয়, তথাকথিত বিশেজ্ঞতার নামে সাহিত্যের কোনো একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বদ্ধ থাকা নয়। ক্ষুদিরামবাবুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাহিত্য এবং ভাষার সব দিকগুলিকে হস্তামলকবৎ করে রাখা।সংস্কৃত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর স্তরে অনুশীলন করেছিলেন। সংস্কৃতের ভিত্তিটা তাঁর খুবই পাকা। আবার শুধু সংস্কৃত নয় ইতিহাস ও দর্শনেও তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি।আজকাল সাহিত্যকে নিছক শিল্প হিসাবে দেখার প্রবণতা প্রচলিত হছে।ফলে আভ্যন্তরীণ বক্তব্য বা বিষয়ের অনুধাবনের চেয়ে 'নির্মাণ' বা ফর্মের উপর সাহিত্যপাঠের সবটা ঝোঁক পড়ছে। ধরা যাক আনন্দমঠের মতো একটি উপন্যাস।তার চরিত্রবিন্যাস এবং ঘটনা সংস্থানের কারুকার্য আলোচনা সাহিত্যপাঠকের কাছে যতখানি গুরুত্ব পায়,ঘটনার ঐতিহাসিক সততা বিচার বা অনুরূপ আভ্যন্তরীণ বিষয়ের জ্ঞানের সেই তুলনায় কোনো গুরুত্ব নেই। ক্ষুদিরামবাবু

কখনোই মনে করেন বলে মনে হয় না যে ,বিষয়ের সততা জানবার দরকার সাহিত্যপাঠকের নেই-শুধু শিল্প হিসাবে বিন্যাসরীতি জানলেই যথেষ্ট। সেইজন্যই তিনি প্রথম দেখালেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যে সময়ে ঘটেছিল সে-সময় মীরজাফর বাংলার নবাব ছিলেন না।

সাহিত্যের অধ্যাপকের বা ছাত্রের এই তথ্য না জানলেও চলে।শুধু গল্প রচনার কৌশল বোঝা এবং তার ব্যাখ্যা করাই তার কাজ। অন্য সব বিচার ঐতিহাসিকের অথবা তত্ত্বজ্ঞের-সাহিত্যালোচনার এই মূল্যমান যে কালের, ক্ষুদিরামবাবু সেই যুগের শিক্ষক নন।তিনি যা জানেন তার সবটাই জানেন, শিল্পরীতিই হোক আর তথ্য বা তত্ত্বই হোক। সুতরাং এর জন্য পড়াশোনা তো শুধু সাহিত্যে নয়, ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞানেও দরকার।ক্ষুদিরাম বাবু সাহিত্যালোচনায় যে বিজ্ঞানকেও নিয়ে এসেছেন, এটাও লক্ষ্য করবার বিষয়।

ক্ষুদিরামবাবুর বাংলা জ্ঞানের গভীরতার কথা বলছিলাম। সংস্কৃতের ভিত্তির উপরেই তার প্রতিষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে খুব ভালো সংস্কৃত জানতেন। ভালো সংস্কৃত জানা সেকালের শিক্ষিত হওয়ারই অন্যতম লক্ষণ ছিল।বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় সংস্কৃত রসশাস্ত্রকে বর্জন করেছিলেন। তারপর থেকে বাংলা সমালোচনার পাশ্চাত্য পদ্ধতিই চলে আসছে। সে দেশেও যে অ্যারিস্টটলীয় পদ্ধতি একই ভাবে চলে এসেছে, তাও নয়।নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনা হয়েছে বাংলা সাহিত্যেও তার অনুকরণ হচ্ছে।কিন্তু সংস্কৃত সমালোচনা-পদ্ধতির পরীক্ষা বাংলা সাহিত্যে কখনোই হয় নি, সে কথাও ঠিক।আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য  রীতি ছাড়া অন্য রীতির কথা শিক্ষার্থীরা প্রায় জানেই না বললে অত্যুক্তি হবে না। অতুল গুপ্ত মশায় বলেছিলেন আলংকারিক পদ্ধতিতে আধুনিক সাহিত্যের বিচার করা সম্ভব।কিন্তু তিনি নিজে এ ভাবে করেননি।কাব্যজিজ্ঞাসায় প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে কয়েক লাইন তুলে দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন মাত্র।তা ছাড়া প্রধানত তিনি ধ্বন্যালোকের দৃষ্টান্তেই ব্যবহার করেছেন। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও তাই করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য স্বীকার করতেন না যে অলঙ্কারতত্ত্ব দিয়ে আধুনিক সাহিত্যালোচনা সম্ভব।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মৌলিকত্ব এখানে।তিনি প্রথম প্রয়োগ করে দেখালেন যে আলঙ্কারিক পদ্ধতি আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বিশেষ করে চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণীতে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যকেই এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।পাঠক যখন পড়েন তখন কাব্য রসাস্বাদনে লেখকের সঙ্গে মগ্ন হয়ে যান-এটা কোনো ভিন্ন পদ্ধতি কিনা সেটা আর তার মনেই আসে না। এতেই বোঝা যায় আধুনিক কাব্যালোচনাতেও এই পদ্ধতি কত স্বাভাবিক হতে পারে। ক্ষুদিরামবাবুর সমালোচনায় এটাই লক্ষ্য করতে হবে যে টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতরা যে ভাবে সংস্কৃত কাব্য পাঠে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেন, তিনি সেভাব করেননি।পণ্ডিতী সমালোচনা পদে পদে বিশ্বনাথ কবিরাজের বিধান উঁচিয়ে তোলে। ক্ষুদিরাম বাবুর সমালোচনা পাঠককে হাত ধরে সৌন্দর্যের নন্দনলোকে পৌঁছে দেয়। তাতে না আছে কৃত্রিমতা, না আছে চেষ্টাজাত ক্লান্তি। এর কারণ আলঙ্কারিক বিচারবিশ্লেষণে সঙ্গে অনন্যপরতন্ত্র ভাবোপলব্ধি।'রবীন্দ্র-প্রতিভার

পরিচয়' বইতেই দেখা গেছে উপনিষদের ভাবনার সঙ্গে আলাদা করে দেখার প্রয়াস,দেখা গিয়েছিল রূপ-অপরূপের কথা, নিসর্গপ্রকৃতি এবং রোমাণ্টিক-চেতনার কথা।অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। তবু একজায়গার তাঁদের সঙ্গে ক্ষুদিরামবাবুর মিলও ছিল।তাঁদের ইঙ্গিত অনুসরণ করে কাব্যের মধ্যে কবিব্যক্তিত্বকে দেখিয়েছেন তিনি-কবিচেতনার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতি।পূর্বসূরীর প্রতি এই ছিল তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য।কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছেন নিজস্ব ভূমিতে।

ক্ষুদিরামবাবুর পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।কলেজে পড়িয়ে অভ্যস্ত অধ্যাপক স্বাভাবতই বাংলা সাহিত্যের সব দিকেরই খোঁজ রাখেন।কিন্তু ক্ষুদিরামবাবুর অধিকারের যে ব্যাপকতা আছে তা আজকালকার দিনে দুর্লভ।প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আত্মবিশ্বাস সহকারে এমন স্বাধীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন সাহিত্যের কারবারীরাও দেননি। তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ মনে পড়ে 'মুকুন্দরামের দেশত্যাগের কাল'। এই প্রবন্ধটির শরণাপন্ন হতে হয়নি এমন বিশেষজ্ঞ কেউ আছেন কিনা জানিনা। প্রতিবাদ বা সমর্থন যাই করুন তাঁকে পাশ কাটিয়ে কেউ যেতে পারবেন না। ভাষাতত্ত্ব এবং ছন্দতত্ত্ব দিয়েও তাঁর মৌলিক চিন্তার কথাও যথাযোগ্য ব্যক্তিরা জানেন। ভাষাতত্ত্বের কোনো কোনো ক্ষেত্র সুকুমার সেনেরও বিরোধী হয়েছেন; ছন্দতত্ত্বের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রতিবাদ করেছেন। এইসব বিরোধিতা বা প্রতিবাদের মূল্য কি ভবিষ্যৎ পাঠক তার পরিমাপ করবেন। আসলে ক্ষুদিরাম বাবুর জোর হচ্ছে তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টির সমন্বয়ে।

ক্ষুদিরাম বাবুর মনের আধুনিকতার নিদর্শন আছে তাঁর শেষের দিকের লেখায়।বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনার সঙ্গে প্রবল সমাজমনস্কতা এসে গেছে।এই সমাজমনস্কতা শেষ পর্যন্ত স্মাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এসে পৌঁছেছে।এটা সবাই পছন্দ করবেন কিনা জানি না।কিন্তু বিস্ময় বোধ করি বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের (যে রসের কথা আনন্দবর্ধন অভিনব গুপ্ত বলে গেছেন)সঙ্গে সমাজচেতনার সহাবস্থান দেখে।একালে বাংলা সাহিত্যে তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত খুঁজতে হয়।

# সমর্পিত

কবি জয় গোস্বামী

# সূচীপত্র


কবিকঙ্কণ মুকুন্দ ৭

কবিকঙ্কণের গ্রামত্যাগের কারণ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ২০

কবিকঙ্কণের কাব্যের পাঠভেদ ও চিন্তা ৩৩

পলাতক কবির সন্ধানে ৪৩

# কবিকঙ্কণ মুকুন্দ

বাঙলার মধ্যযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং শ্রেষ্ঠ মানবিক কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীকে নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা সেই রামগতি ন্যায়রত্নের সময় থেকে আজ পর্যন্ত হয়ে এলেও সম্প্রতি নোতুন তথ্য ও উপাদান আবিস্কৃত হওয়ায় এবং সেই সঙ্গে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিচারে নোতুন দৃষ্টিকোণ প্রসারলাভ করায় নোতুনতর এবং সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ ঘটেছে।

কবিকঙ্কণের রচনা চন্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল দু'টি পৃথক্ আখ্যায়িকা নিয়ে সম্পূর্ণ । জীবনগত উপাদানের দিক দিয়ে দেখলে কাহিনী দু'টি পৃথক্ স্তরের, একটিতে সমাজের সবচেয়ে নিচুমানের অর্থাৎ অন্ত্যজ ও দরিদ্রতম শ্রেণীর নরনারী, অন্যটিতে তখনকার অর্থসম্পদ-পরিপুষ্ট বণিক-সংসার আর এ দুয়ের এবং সেই সঙ্গে নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের সূত্রধার হিসাবে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনের প্রতিনিধি ও জাতিবর্ণ-বৃত্তিভেদের নিয়ামক ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র- সমর্থিত বাঙলার ছোট-বড় ঐতিহাসিক জমিদারকুল।কবি মুকুন্দ মুখ্যভাবে দীনতম ও সমৃদ্ধতম দুটি পরিবারকে নিয়ে প্রচলিত প্লটের সূত্রে কাব্য নির্মাণ করলেও মধ্যবর্তী জীবনধারাকে ভোলেন নি, যেখানে পেরেছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত অবকাশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে গোটা সমাজটাকেই শ্রোতা বা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

এখন গীতিকাব্য অর্থাৎ অন্তর্মুখ বা একান্ত আত্মভাষী কবিতা রচনার কাল চলছে। এই শ্রেণীর আধুনিক কবিদের রচনার বাস্তব পৃথিবীর সুখ-দুখ দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত মানুষকে তার যথাস্থিত আকৃতিতে পাবার উপায় নেই। তার উপর কবিরা কোথাও তাঁদের নিগূঢ় ও মত-প্রভাবিত অহংকে রূপ দেওয়ার জন্য এমনই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন যে মানুষ এবং সমাজ তার প্রকাশের প্রতিনিধি পাচ্ছে না।অন্তর্গূঢ় ভাষণের মর্ম অনুধাবন করতে না পেরে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসছে। চারশ'

বছর আগেকার কবি মুকুন্দের মত অ-বিমিশ্র সামাজিক কবির স্পষ্ট ভাষণের বিচিত্র বাণীর প্রতীক্ষায় মানুষ দিন গুনছে, কিন্তু প্রাপ্তি হয়েছে দুর্লভ ।তা-ই যখন বর্তমান পরিস্থিতি, তখন মধ্যযুগের এই আশ্চর্য বাস্তব-বর্ণের কবিকে তাঁর প্রকৃত স্বরূপে একবার দেখে নিতে দোষ কী।

বর্তমান বর্ধমান জেলার পুব-দক্ষিণ প্রান্তের দামিনীয়া গ্রামের অধিবাসী জগন্নাথ মিশ্রের পৌত্র এবং হৃদয় মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দ খ্রীঃ ১৫৬০-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে জন্মান। এই অনুমান করা যাছে, কবির স্বগৃহ ত্যাগ ক'রে আরড়া গ্রামের জমিদারের আশ্রয়ে চলে যাওয়ার এবং কিছু পরে কাব্য রচনা আরম্ভ করায় প্রায় নিশ্চিত সময় -১৫৯৫ ও ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ ধ'রে। কবি যখন দামিনীয়া ত্যাগ করেন তখন তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং বেশ মনে করা যেতে পারে যে কবি চল্লিশ বছরের কাছাকাছি সময়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে চণ্ডীমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেছিলেন। আর কবির কাব্যে যে সমাজ ও জীবন চিত্রিত হয়েছে তা ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের জীবনধারা, যার কিছু পরিচয় দক্ষিণ বর্ধমানের পাশাপাশি অঞ্চলের এবং জঙ্গল কেটে জমিদারি-পত্তন করা আরড়া ও নিকটবর্তী চন্দ্রকোণা (=চান্ধের কোণা=উর্বরা) প্রভৃতি স্থানের।শালবনী স্টেশন থেকে মেইল পাঁচেক উত্তর-পুবে আরড়া গ্রাম, তার বিশাল চতুষ্কোণ দীঘি, দীঘির চারপাশে পাহাড়ের মত উঁচু পাড়ে জমিদার-গৃহ, কাছারি, চারপাশে পরিখা এবং পাথরের তোরণ, প্রবেশদ্ধার প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়। বস্তুত ঐ গ্রামের 'আরড়া' নামকরণ জমিদার-গৃহ দৃষ্টে লোকমুখে উংপন্ন। সাঁওতালী ভাষায় 'আড়' মানে উঁচু পাঁচিল এবং 'অড়া' মানে গৃহ। আড়-অড়া উচ্চারণে আড়ড়া এবং তা থেকে আরড়া, আড়রা। গ্রাম এবং সন্নিহিত জমি জায়গা ও ছোটখাট অন্যান্য গ্রাম আজও শাল অরণ্যে বেষ্টিত এবং মুখ্যভাবে নিম্নশূদ্র বর্ণের মানুষের বাসভূমি। কবি এখান থেকে সওয়া শ' মাইল উত্তর-পুবের দামিনীয়া গ্রামে কাটান জীবনের প্রথম-অর্ধ, তারপর আমৃত্যু তাঁর আরড়ার জমিদারের আশ্রয়ে সুখেই কাটে।

কবিকঙ্কণের যৎসামান্য জীবন-পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র ভণিতায় এবং বিশেষভাবে গ্রন্থারম্ভে প্রদত্ত তাঁর আত্মপরিচয়ে। এই পরিচয় অংশে তিনি তাঁর স্বগ্রাম ও গৃহ পরিত্যাগের কারণ বিবৃত করেছেন। এই অংশটি সাহিত্যের পক্ষে যেমনই হোক, দেশের ইতিবৃত্তের দিক দিয়ে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ ।এই ঘটনায় তিনি বাঙলার ইতিহাসের রাষ্ট্র-পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছেন। বাঙলার কোনো সাহিত্যিকের পক্ষে এরকম ঐতিহাসিক স্মৃতি অর্জন করা কম গৌরবের কথা নয়। এই ঘটনা তাঁর গৃহত্যাগের এবং সাময়িক দুঃখের কারণ হলেও পরবর্তী জীবনে তাঁকে সুখী করেছে এবং কাব্য নির্মাণের হেতু হয়ে তাঁকে অমর করে রেখেছে। অতএব, ব্যাপারটির সংক্ষিপ্ত

পরিচয় আবশ্যক ।'শূন ভাই  সভাজন/কবিত্বের বিবরণ /এই গ্রন্থ হৈল যেন মতে' ইত্যাদিক্রমে কবি এই গুরুত্বপূর্ণ আত্মবিবরণ আরম্ভ ক'রে দামিনীয়ায় তাঁর সাত পুরুষের বসবাস ('মিরাস পুরুষ হৈল সাত') এবং গোপীনাথ নন্দীর তালুকে তাঁর চাষবাস করার বিবরণ দিয়েও সুবাদার মানসিংহের গৌরব তথা নব বিষ্ণুভক্তির অজস্র প্রশংসা  ক'রে ('ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে নব ভৃঙ্গ')নিজের সাময়িক দুর্বিপাকের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। কবিকে  এবং সেই সঙ্গে এই অঞ্চলের গ্রামবাসীদের ঠিক কী বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছিল এবং কেন তা বুঝতে হলে এই সময়কার মোগল রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি ও নব্য প্রশাসন-রীতি সহ ভূমিব্যবস্থার বিষয়  জানতে হবে।

১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দে আকবর মুনিম খাঁ ও তোড়রমল প্রভৃতির সহায়তায় পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত ক'রে নামে মাত্র বাঙ্‌লা অধিকার করেন।বাঙ্‌লা বিহার ওড়িশা তার আগে ছিল পাঠান সুলতানদের দখলে এবং তারপর পাঠান সরদার ও জমিদারদের দখলে,বিশেষে বাঙলা ও ওড়িশা।এদের  সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে একচ্ছত্র মোগল রাজ-অধীনতার আনা আকবরের রাজত্বকালেও সম্ভব হয়নি। তোড়রমলের পর মানসিংহ ১৫৯২ খ্রীঃ কতলু খাঁকে কৌশলে নিহত ক'রে ওড়িশা অধিকার করেন।তারপর দিল্লী গিয়ে আকবরের কাছ থেকে বিশেষ পরামর্শ  নিয়ে ১৫৯৪ খ্রীঃ পাকাপাকিভাবে বাঙলার সুবাদার হয়ে আসেন, যোগ দেন এপ্রিলের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১লা বৈশাখ। আকবরের পরামর্শ ছিল নোতুন প্রশাসন পদ্ধতি ও রাজস্ব আদায় বিষয়ে। তোড়রমলকে মুখ্য উপদেষ্টা ও সংস্কার সমিতির চেয়ারম্যান ক'রে  আকবর তাঁর সমস্ত সুবায় সুবাদার ছাড়া উজীর অর্থাৎ দেওয়ান বা মুখ্যসচিব, তারপর বক্‌সী, সদর, আমল-গুজার, আমিন, কোতোয়াল, শিকদার, কাজি, সরকার প্রভৃতি অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম বেঁধে দেওয়ার জন্য প্রবর্তিত হয় জমিজমার প্রকৃতি ও উৎপন্ন শস্যের নিরিখে তোড়রমলের 'আসল তুমার জমা'। ১৫৮৬-৮৮ খ্রীঃ মধ্যেই অন্যান্য সুবায় এই সব প্রশাসন-সংস্কার চালু হয়ে যায়। বাঙলা ওড়িশায় করা যায়নি এজন্য আকবরের উদ্‌বেগ ছিল। ১৫৯২-এ মানসিংহ ওড়িশা বিজয় শেষ ক'রে জগন্নাথ মন্দিরে বিষ্ণুভক্তির প্রাবল্য প্রকাশ ক'রে গৌড়ে ফিরে এলে পর আকবর মানসিংহকে দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। ওড়িশা বাঙলা রইল প্রবীণ দেওয়ান রায় পত্রদাসের পরিচালনায়। ১৫৯৪-এ মানসিংহ বাঙ্‌লায় এসেই পূর্ব বাঙলায় অভিযান করলেন ঈশা খাঁ ও তাঁর সহায়কদের দমন করতে। ইতিমধ্যে নয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলতে লাগল। রায় পত্রদাসের পুত্র রায়জাদা কিসুদাস হলেন উজীর ('উজীর হৈলা রায়জাদা') হয়েই পূর্ব -নির্ধারিত ব্যবস্থামত ব্যবসায়ীদের প্রশাসনে লাগলেন।তারা শেরশাহের পরবর্তী সময় থেকে ভিন্ন ভিন্ন ওজনে ও মাপে এবং মুদ্রার মানমুল্য নিয়ে লোক  ঠকিয়ে খাচ্ছিল। জমির পুরানো মাপ থেকে আকবর-নির্ধারিত  নোতুন মাপ,যা সারা ভারতে প্রচলন করা হ'ল, তা আগেকার থেকে পরিমাণে

একটু কম হওয়ায় এবং সেই অনুসারে জমিজমার পরিমাণ নোতুন ক'রে নির্দিষ্ট হতে থাকায় প্রজাদের বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। জমির নোতুন ক'রে কর-নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রারব্ধ হ'ল। একমাত্র গো-চর জমি এবং বনঝাড় ছাড়া অন্য সব জমিতে যাতে ফসল হয় সে বিষয়ে আকবরের প্রবল আগ্রহ ছিল। অথচ চাষীদের অভ্যাস ছিল আবাদ-যোগ্য জমিও পতিত রাখা। এর প্রতিবিধানের জন্য উন্নতমানের না হলেও আবাদযোগ্য জমি মাত্রেই করের আওতায় আনা হ'ল। 'আসল তুমার জমা'য় নিয়ম এই ছিল যে, প্রজাদের খাজনাখানায় প্রত্যক্ষভাবে মুদ্রায় কর জমা দিতে হবে।এই বিষয়টিই কৃষক প্রজাদের পক্ষে গুরুতর অসুবিধাজনক হয়েছিল।

এদিকে আগেকার আমলের মুদ্রার ধাতুমূল্য প্রচলিত আকবরী মুদ্রার ধাতুমুল্য থেকে কম হওয়ায় পুরানো মুদ্রায় খাজনা দিতে গিয়ে পরিবর্তে কিছু বাট্টা ও দিতে হ'ল।সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষে চাষী প্রজাদের সহসা বেশ হয়রানি এবং অর্থদণ্ডের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। আবার ব্যক্তিগতভাবে কবি মুকুন্দকে আরও দুর্বিপাকে পড়তে হয়েছিল। তিনি যার তালুকদারিতে জমিজমা ভোগ করতেন সেই গোপীনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ('প্রভু গোপীনাথ নন্দী/বিপাকে হৈলা বন্দী/হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে')। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর অধিকারের জমিজমা এবং প্রদেয় কর নিয়ে এমন গোপনতা করেছিলেন যাতে তাঁর কারা-মুক্তি সহজে সম্ভব হয়নি।তালুকদারের অধিকার নাকচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজ  জমিতে অধিকার বাজেয়াপ্ত হবার মত হয়েছিল।অন্তত সাধারণের এই ধারণাই হয়েছিল।এই ঘটনাটিই কবির গ্রামত্যাগের ও গৃহত্যাগের বিশেষ কারণ হয়েছিল বুঝতে হবে।কারণ অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত সাত পুরুষের বাস ও জমিজমা ছেড়ে কেই বা অন্যত্র পালাতে চায়?কবি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর এলাকার ডিহিদার অর্থাৎ  গ্রাম-প্রধান ও গ্রাম-প্রশাসককে এবং সেই সঙ্গে জমিজমার হিসাবরক্ষক 'সরকার'কে ঘুষ দিয়ে কোনো সুবিধা করা যায় কিনা। কিন্তু পরিস্থিতি এতই কড়া ছিল যে তাঁরা কিছুই করতে পারেন নি। কারণ, সংস্কার আরম্ভ হয়েছিল সংগ্রামী দ্রুতপদে, মানসিংহ ছাউনি নিয়ে কাছাকাছিই ঘুরছিলেন-আজ সেলিমাবাদে, কা'ল জাহানাবাদে, সুতরাং কর্মচারীরা ঘুষ নিতেও চাননি। নিলেও কারও উপকারে আসতে পারেন নি। আমাদের কবি মুকুন্দ নোতুন প্রশাসন পত্তনের এই সব হেরফের ধরতে পারেন নি। অন্য  পাঁচজনের মত কপালে করাঘাত ক'রে পরিশেষে গৃহত্যাগ করলেন। গ্রামীণ মানুষের কাছাকাছি সম্পর্ক  গ্রাম-প্রশাসক (ডিহিদার), সরকার প্রভৃতির সঙ্গে। ডিহিদারের উপর  নির্দেশ  ছিল, কোনো কৃষক প্রজা না পালিয়ে যায়। এজন্য 'জানদার' পুলিস এবং চরও নিযুক্ত হয়েছিল। আমাদের কবিরও প্রত্যক্ষ ক্রোধ গিয়ে পড়েছিল ডিহিদার, সরকার ও পোতদার বা মুদ্রা প্রীক্ষকের উপর ('ডিহিদার অবুঝ খোজ/কড়ি দিলে নহে রোজ' 'পোতাদার হৈল যম, টাকা আড়াই আনা কম' 'সরকার হৈল কাল খিলভূমি লিখে লাল')।ফলে কবিকে রাত্রিতে অতি

সংগোপনে সপরিবারে পালাতে হয়েছিল। কখনো নৌকায়,অধিকাংশ পথই হেঁটে, পথে দুর্বৃত্তদের হাতে প'ড়ে, পরিচিত ব্যক্তির বাড়ীতে লুকিয়ে, আন্দাজ করা যায় দশ বারো দিন পরে এসে পৌঁছেছিলেন আরড়ায় জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে। বেশ বোঝা যায়, এ আশ্রয়ের কথা তিনি কিছুকাল আগেই চিন্তা করে রেখেছিলেন। নতুবা 'যেদিকে দুচোখ যায়' এইভাবে বেরিয়ে এরকম আশ্রয় পেতে পারতেন না। 'সহায় শ্রীমন্ত খাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ'-তিনিই এরকম যোগাযোগ ক'রে দিয়ে থাকবেন।কবি তাঁর যাত্রাপথের বর্ণনাও দিয়েছেন। ঐ পথ অনুসরণ ক'রে আমরাও কৌতূহলী হয়ে একবার পদযাত্রা করেছিলাম। দেখেছিলাম কবির বর্ণনা সঠিক।তবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলে 'আমোদর' নদীর জায়গায় ভূলক্রমে 'দামোদর' ছাপা হয়েছে। কামারপুকুরের নিকটবর্তী 'আমোদর কবির যাত্রাপথের মধ্যেকার নদীগুলির একটি। যাত্রাপথটাই পশ্চিম, তারপর দক্ষিণ দিকে, আর দামোদর হ'ল দামিনীয়া জাহানাবাদ প্রভৃতির পুব দিকের নদী। প্রথমে 'মুড়াই',তারপর 'দারুকেশ্বর',তারপর আমোদর, নারায়ণ, পরাশর, শিলাই সব নদী আজও ঠিক আছে, কেবল নারায়ণ পরাশর খুবই মজে এসেছে এবং ভিন্ন নামের খাল হয়ে পড়েছে বর্তমানে। 'দারুকেশ্বর তরি পাইল পাতলি পুরী'-এই পাতুল গ্রাম আজও ঠিক আছে, আর যে 'গুচুড়ে' গ্রামে কবিকে অনশনে পুকুরপাড়ে কাটাতে হয়েছিল এবং যেখানে নিদ্রায় স্বপ্নে চণ্ডীমঙ্গলের প্রেরণা তিনি পান তাও সদ্য-পরিবর্তিত নামে এখনও ঠিক আছে। আমরা আন্দাজ ক'রে গুচুড়ে গ্রামের সেই 'আশ্রয় পুকুরি-আড়াটা'ও নির্ধারণ ক'রে এসেছিলাম। তারপর শিলাই পার হয়ে জঙ্গল পথে আরড়া-গড়। ভারি মজার ব্যাপার। এইভাবে লুকিয়ে এসে নিদারুণ কায়ক্লেশে আরড়ায় পৌঁছে কবি মধ্যযুগের একটি অবিস্মরণীয় কাব্যকাহিনী রচনা করেন-এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে?

কবি বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় পেয়েছিলেন। আসতেই কবি বিশ পঁচিশ মণ ধান এবং থাকার জায়গা পেলেন এবং জমিদারগৃহের শিশুদের অর্থাৎ বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের এবং সম্ভবত তাঁর ভাইয়ের শিশু পুত্রদের –গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। নূতন জীবন এবং অতিশয় সুখের জীবনই বলতে হবে।যখন বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় জমিদার হলেন (আঃ ১৬০০ খ্রীঃ) তখন থেকে তিনি কবিকে গুরুতুল্য সম্মান ও সেবা করতে লাগলেন।কবি সম্পর্কে আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগেকার প্রাথমিক অনুসন্ধানে একটা ভুল ঘটেছিল। বাঁকুড়া রায়ের জমিদারির সময়-১৫৮০ থেকে ১৬০০ খ্রীঃ-কে তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের জমিদারির কাল ব'লে ধরা হয়েছিল। কাব্যের ভণিতাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রথম আরড়ায় গিয়ে কবি বাঁকুড়া রায় কর্তৃক সংবর্ধিত হলেও কাব্য আরম্ভ করার পর থেকে রঘুনাথ রায়ের প্রেরণা ও উত্তরোত্তর প্রচুর সম্মান তিনি পেয়েছিলেন।

সময় বদলায়। আজকের দিনে মধ্যযুগ সামন্ততান্ত্রিক অমানবিক যুগ ব'লে নিন্দিত। কিন্তু দেখতে হবে, সব পরিস্থিতিরই কিছু দোষ কিছু গুণ থাকে, তা ছাড়া মানুষ-চরিত্রেরও মন্দ-ভালো আছে। বিচারে দেখা যায়, ইংরেজ শাসশের জমিদারি আমল থেকে মধ্যযুগের জমিদারি-প্রশাসন ঢের বেশি মানবিক ছিল। বিবিধ ঐতিহাসিক নজির থেকে দেখা যায়-পাঠানই হোক আর মোগলই হোক, দিল্লীর হোক অথবা বাঙলার হোক, সুলতান অথবা সুবাদার চাইতেন যে কৃষি উৎপাদন বাড়ুক আর কৃষকেরা অত্যাচারিত না হয়। এ বিষয়ে তাঁরা জমিদারদের বারংবার সাবধান করেছেন, কালেক্টার আমিন প্রভৃতিকেও নির্দেশ দিয়েছেন। এই মর্মে যে, প্রজারা অত্যাচারিত হয়ে পালালে উৎপাদন ব্যাহত হবে, রাজস্ব কম হবে।বর্তমানে জমিজমা এবং লোকসংখ্যার অনুপাত ১;২, কিন্তু তখন ব্যাপারটা প্রায় উল্টো ছিল। জমি বেশী, চাষী কম। কবিকঙ্কণের বর্ণনায় দেখা যায় কালকেতু জমিদারি পেয়ে নানান সুখ-সুবিধার ও কর-ছাড়ের আশ্বাস দিয়ে তবেই প্রজাদের বসাতে পারছে। গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক পরিস্থিতি তো ইংরেজ আমলেও অক্ষুণ্ন ছিল,আর আজও কি তা সম্পূর্ণ বিদায় নিয়েছে? যাই হোক,জমিদারতন্ত্রের কাল হলেও মধ্যযুগে সাহিত্যে ও শিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হবে! চণ্ডীদাসের রচনা মঙ্গল-কাব্য, অজস্র বৈষ্ণব পদাবলী, রামায়ণ-কাব্য, মায় আলাওল ভারতচন্দ্র পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য, ওড়িশার ভাস্কর্য-এসব তো মধ্যযুগের সামন্ত প্রথারই অবদান। দেখতে হবে ,কর্মক্ষম হলে তখনকার দিনে দীনতম মানুষেরও একমুঠো ভাতের অভাব হ'ত না, ভিক্ষাগত জীবিকাও ঘৃণার বস্তু ছিল না। জাতিবর্ণ-বিভেদের অমর্যাদাটাই ছিল গুরুতর, যা থেকে শ্রীচৈতন্য অধম-পতিতের উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। এও দেখতে হবে যে আমাদের স্বদেশী আমল থেকে আজ পর্যন্ত ধর্ম নিয়ে হিন্দু-মুসলমান যে বিরোধ চলছে, মধ্যযুগে তা ছিল না, দুই ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রীতি-সহানুভূতি সহ পাশাপাশি বাস করেছে। ধর্মান্ধতা অর্থাৎ গোঁড়ামি নিয়ে আজ আমরা কোথায় এবং কেন?

ইতিবৃত্ত গেল, এরপর কাব্যকথা। মধ্যযুগের নিয়ম ছিল কাহিনী কাব্যগুলিকে পালা-পর্বে বিভক্ত ক'রে সংগীতের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের কাছে পরিবেশন। বৈষ্ণব পদাবলীর তো কথাই নাই, রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, লোর-চন্দ্রাণী, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি বহু কাহিনীকাব্যই পালাবদ্ধ গীত।গায়কের পর গায়ক দিনে রাতে সুবৃহৎ আসরে এসব কাব্য সুরে আবদ্ধ ক'রে শুনিয়েছেন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। কবির মূল রচনার বহু অনুলিপি করা হয়েছে। তা থেকেও নকল করা হইয়েছে বিস্তর। পালা গায়কেরা গানে প্রযুক্ত করার জন্য কবির রচনার মধ্যে কিছু সংযোজন করেছেন, কিছু বাদও দিয়েছেন। লেখকেরা অনুলিপি করতে গিয়ে হ্রস্বদীর্ঘ নকার-শকার ঠিক রাখেন নি।এইভাবে কবির মূল রচনা বর্ণনে ও পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। যে কাব্যের গীতে প্রচলন বেশি হয়েছে তার রূপান্তরও ঘটেছে তত বেশি। যেমন ক্রত্তিবাসী

রামায়ণ। এর বহু আখ্যায়িকা পরবর্তী পালাগায়কদের যোজনা। কবি মুকুন্দের কাব্যেরও কিছু অদল বদল ঘটেছে কালক্রমে, অজ্ঞ পালাগায়ক ও লিপিকর কবির যেসব সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দ বুঝতে পারেন নি তা নিজের মত ক'রে-মিলিয়ে নিয়েছেন স্বচ্ছন্দে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কবি লিখেছিলেন-পাথরে আমান্ন ভরি/দিল সঞ্জয়ের নারী। প্রথা আছে বিবাহের পরদিন বরকন্যা বিদায়ের সময় একটা পাত্র ভর্তি করে চা'ল দিতে হয়। কবি এখানে সেই বর্ণনাই দিচ্ছেন। আমান্ন শব্দটির অর্থ না ধরতে পেরে পালাগায়ক অথবা লিপিকর তাকে 'আমানি' করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে সেই ভূল পাঠই ছাত্রেরা পড়ছে। কলিঙ্গ রাজবাটীতে প্রভাতের বর্ণনার কবি লিখেছিলেন-'হইল প্রভাত কাল/বরঙ্গ ফুকারে কাহাল'। বরঙ্গ্ ফারসী শব্দ, অর্থ ভেরী তূরী। আর কাহাল অর্থে বাদ্যকর।বরঙ্গ্ শব্দের অর্থ না জানার এবং কাহালও তথৈবচ হওয়ায় পুঁথিতে অর্থহীন পাঠ পাওয়া গিয়েছিল 'বরগো ফুকারে কাল'। অনুরূপভাবে 'গলে দিল হাত্থা ফুলমালা' এই মূল পাঠকে বদল করে গায়কেরা করেছিলেন 'গলে দিল বনফুলমালা'। হাত্থা আরবী, তার অর্থ বাড়ীর আশপাশ। এরকম পরিবর্তন প্রচুর।তার উপর তাঁরা ষোল পালা গান সম্পূর্ণ করার জন্য বাড়িয়েও ছিলেন কিছু, বর্জনও করেছিলেন যথেচ্ছ।অধুনা পুরানো পুঁথি মিলিয়ে আমরা সব দিক বিচার ক'রে কবির মূল রচনায় পৌঁছবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্যণীয় এই যে, কবিকঙ্কণের কাব্য কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত একেবারে সমাচ্ছাদিত হয়ে পড়েনি, এই রক্ষা।এতক্ষণে বোধ হয় কাব্য-কাহিনীর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

চণ্ডীমঙ্গলে দু'টি পৃথক কাহিনী, কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি বণিককে নিয়ে। পৃথক দু'টি আখ্যায়িকা-কাব্যের একমাত্র সূত্র হ'ল চণ্ডীর আত্মপূজা প্রচার। কাহিনী দুটি কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-সৃষ্ট নয়। পূর্বাপর প্রচলিত। কিন্তু কাহিনীর কাঠামো আশ্রয় ক'রে মনুষ্যজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি ফুটিয়ে তোলাই বড় কথা। মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য কবিদের তুলনায় কবি মুকুন্দ এ বিষয়ে আশ্চর্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার উপর তিনি সেই ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের, আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগেকার বাঙলার রাষ্ট্র ও সমাজকে ছবির মত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বা জমিদারি প্রশাসনের কোনো অবস্থাকেই তিনি বর্জন করেন নি, কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বর্ণনার অবকাশগুলিকে রাষ্ট্রশাসিত মানুষের জীবন-কথায় পূর্ণ করে তুলেছেন। এই অসামান্যগুণেই তিনি আজও বিশিষ্ট। আমাদের কবি দেখিয়েছেন অন্ত্যজ অস্পৃশ্য মানুষ মূল হিন্দুসমাজ থেকে কতই না দূরে, তারা যেন ভিন্ন শ্রেণীর জীব। একদিকে প্রবল ঘৃণাভোগ ও দুঃসহ দারিদ্র্যের ছবি, আবার অন্যদিকে রাষ্ট্র-সহার বণিক জীবনের বিলাস।এরই মধ্যে অবশ্য তিনি দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্যাহত লাঞ্ছিত জীবনে নিয়ত অভাবের বিষজ্বালা থাকলেও দাম্পত্য মাধুর্যে তা সহনীয়। অন্যপক্ষে ধনীর সংসার কলহ-বিচ্ছেদে এবং নিন্দা-গ্লানিতে পঙ্কিল।তার

উপর তাদের বিপদের সম্ভবনাও কম নয়। কালকেতুকেও কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে,কিন্তু সে তার ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার পর, তার পুর্বে নয়।মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর মহিমা কীর্তিত হয়নি এমন নয়, কিন্তু সে তত্ত্ব মুখ্য নয়।কবির কাছে মুখ্য হয়েছে সাহিত্যরস-পরিবেশন।এর প্রথম আখ্যায়িকা বা আখেটিক কাহিনীর মূল প্লট হ'ল জাতিবর্ণের বিচারে হীনতম এবং সব থেকে নিঃসম্বল অথচ নিতান্ত সরল ও ধর্মপ্রাণ একটি দম্পতিকে রাজপদে অর্থাৎ ভূম্যধিকারীত্বে প্রতিষ্টিত করে চণ্ডীর নিজ মহিমা প্রচার। মূল কাহিনী এই হলেও কালকেতুর রাজ্যলাভ এবং রাজ্যরক্ষা ও পূজা প্রচার সরলরেখা ধ'রে ঘটেনি। প্রথমে গোধিকাবেশে ও পরে অপরূপ নারীমূর্তি ধ'রে চণ্ডীর ছলনা, শেষে কালকেতুকে প্রচুর অর্থ ও  বহুমূল্যে অঙ্গুরীয় দানের একটি চমৎকার ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ছলনার সংঘাত অবলম্বন করেই কালকেতু ফুল্লরার চরিত্রের সরলতা ও তেজস্বীতা, তাদের দাম্পত্য জীবনের মাধুর্য ও দারিদ্র্যদুঃখ কবির অপরিসীম সহানুভূতির সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।এই অংশই কালকেতু-কাহিনীর মধ্যে কাব্যগুণে সর্বশ্রেষ্ট অংশ, নাটকীয় চারিত্রিক দ্বন্দের দিক থেকেও অপূর্ব।এর পরের ঘটনা হল কালকেতুর গুজুরাট অর্থাৎ ছোট রাষ্ট্রে রাজ্য পত্তন এবং সেই সূত্রে হিন্দু-মুসলমান ও হিন্দুদের বিভিন্ন জাতির সমাজ, জীবিকা ও চারিত্রিক পরিচয়দান।সমাজ ইতিহাসের দিক থেকে এই অধ্যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।কালকেতুর রাজ্যপাটও নিরবচ্ছিন্ন সুখের হয়নি। ধূর্ত প্রবঞ্চক ভাঁড়ুদত্তের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হল।পার্শ্ববতী নরপতি, কলিঙ্গরাজ তার প্ররোচনায় গুজুরাট আক্রমণ করলে এবং তারপর যুদ্ধে কালকেতুর বন্দীত্ব,ভূলের জন্য কলিঙ্গরাজের ক্ষমা প্রার্থনা এবং পরিশেষে পুত্রের উপর জমিদারির ভার অর্পণ করে দম্পতির স্বর্গে গমন। এই অংশ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির দিক থেকেও খুবই মূল্যবান্।এইভাবে দেখা যায়,চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী পুরানো হলেও  কবি মুকুন্দ তাঁর কল্পনা,বর্ণনশক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিকোণকে সঙ্গী করে নিপুন সাহিত্যিকতার সঙ্গে মধ্যযুগের মানুষ ও সমাজের প্রায় সম্পূর্ণ পরিচয় উপহার দিয়েছেন।তবু কিছু বাকিও ছিল। তা হ'ল তখনকার দিনের ধনীদের জীবনচিত্র। এই অভিপ্রায় তিনি সিদ্ধ করলেন ধনপতি বণিকের সংসারচিত্র অঙ্কন ক'রে । তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের এটি দ্বিতীয় আখ্যায়িকা। এ আখ্যায়িকার প্রধান আকর্ষণ সপত্নী-বিলাস-বিড়ম্বিত জীবনের সাংসারিক দুঃখভোগ ও বাণিজ্যের দ্বারা অতিরিক্ত ধন সঞ্চয়ে বিপত্তি। অবশষে চণ্ডীর কৃপায় দুঃখ-বিড়ম্বনার সমাধান। এই অংশে কবির নারীচরিত্র অঙ্কনে সিদ্ধি এবং তখনকার ধনীসমাজের নারী-পুরুষের চারিত্রিক অধঃপতনের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্যণীয় হয়েছে। কবি দেখিয়েছেন,অপরিসীম দারিদ্র্যদুঃখ ফুল্লরা-কালকেতুর দাম্পত্য জীবনকে বিষতিক্ত করতে পারেনি,কিন্তু ধনৈশ্বর্য লহনা-খুল্লনা-ধনপতির ভোগের  সংসারকে নিম্ন শ্রেণীর কলহে এবং অমানবিক প্রতিশোধ গ্রহণে কদর্য ক'রে তুলেছে। ধনীগৃহে দাস-দাসীরাও কিভাবে কলহে ইন্ধন দেয় ও সুযোগ সন্ধান করে তাও কবি দেখাতে ভোলেন নি।এই অংশের বর্ণনায় সপত্নী-কলহ, খুল্লনার নির্যাতন ভোগ ,কারাগারে

শ্রীমন্তের পিতৃমিলন প্রভৃতি অংশ কবিত্বের দিক থেকে স্মরণীয়। আর সেকালের বাণিজ্যের রীতি, সামন্তরাষ্টের সঙ্গে বণিকের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্র-প্রশাসন-পরিচিতির দিক থেকে ঐতিহাসিক মূল্যের।এই কবির ইঙ্গিতমাত্রেই সমাজ তার বিশিষ্ট প্রকৃতি নিয়ে পুনঃ পুনঃ এসে ধরা দিয়েছে,যার ফলে চারশ' বছর আগেকার আমাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিবৃত্ত জানতে হ'লে কবিকঙ্কণের কাব্য ছাড়া গতি নেই।

প্রথমে দু'একটি দৃষ্টান্তে কবিকঙ্কণের কবিত্বশক্তি দেখা যেতে পারে।ফুল্লরার বারমাস্যা নামক অংশে ফুল্লরা তার নিঃসীম দারিদ্র্য নিয়ে আমাদের কাছে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সত্য,তবু এমন হতে পারে যে কল্পিত সপত্নী-ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে হটাতে গিয়ে সে তার সাংসারিক দুঃখ অল্পস্বল্প বাড়িয়ে বলেছে।কিন্তু ঠিক এর পরেই হিত-উপদেশ এবং পরিশেষে বারো মাসের দুঃখের বিবরণও যখন কল্পিত সপত্নীকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারলো না তখনকার বিহ্বল অবস্থার বর্ণনাতেও কবি মুকুন্দের লেখনী অপরাজেয় হয়েছে।কবি স্বল্পাক্ষরেই এসব বলেছেন। আবার এর পরেই হাটে কালকেতুর সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা যেমন নাটকীয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ, সেই সঙ্গে তেমনি ব্যঞ্জনাপূর্ণ হয়েছে দেখা যায়-

*ভালমন্দ চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর।*
*বীরের সমীপে রামা চলিল সত্বর।।*
*বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী।*
*নয়নের জলে হৈল ম্লান মুখশশী।।*
*কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।*
*কি জানি কি করে বিধি ভাবে মনে মন।।*
*হাকান্দ ক্রন্দনে কান্দে পুঁছে চক্ষুনীর।*
*সবিস্ময় হৈরা জিজ্ঞাসে মহাবীর।।*
*শাশুড়ী ননদ নাহি নাহি তোর সতা।*
*কার সনে কলি করি চক্ষু কৈলি রাতা।।*
*সতা-সতী নাহি তবু তুমি মোর সতা।*
*ইবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা।।*
*পিপিড়ার পাখ উঠে মরিবার তরে।*
*কাহার ষোড়শ্যা কন্যা আনিয়াছ ঘরে।।*
*কি লাগিয়া বীর ইবে পাপে দিলে মন।*

*আজি হৈতে হৈলে তুমি লঙ্কার রাবণ।।*
*শিয়রে কলিঙ্গ রায় বড় দুরাচার।*
*তোমারে বধিয়া জাতি লইব আমার।।*
*ব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।*
*মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।।*
*সত্য মিথ্যা বচনে আপনে ধর্ম সাক্ষী।*
*তিন দিনের চান্দ হেল্যা দ্বারে বস্যা দেখি।।*

সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল বর্ণনা। এবং এরই মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটে উঠেছে । পরবর্তী কাহিনীর ধনপতির চরিত্র এ নৈতিকতা নেই এবং সপত্নী সহ দাম্পত্যে প্রণয়-বেদনার ঘনীভূত মাধুর্যও অবিদ্যমান।তবু কবিত্ব আছে, ধনপতি কর্তৃক লহনাকে কৌশলে প্রবোধ দেওয়া, দুর্বলা দাসীর লহনাকে প্ররোচনা, লহনা-খুল্লনার বাক্-বিনিময়, খুল্লনার বারমাসিয়া এবং শ্রীমন্তের পিতৃ-বাৎসল্য প্রভৃতি অধ্যায় হিসাবে মনোজ্ঞ। আর সর্বোপরি প্রশংসার যোগ্য হ'ল বৃত্ত ও কাহিনীকে সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্তে এনে কবিকঙ্কণের চারিত্রিক দ্বন্দ্বের গ্রন্থন। কালকেতু কাহিনীতে ফুল্লরার অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে বহির্দ্বন্দ্বের যেখানে মিশ্রণ ঘটেছে,এমন স্থানগুলিই কাব্যনির্মাণ হিসাবে অপূর্ব হয়ে উঠেছে।তার উপর রয়েছে নারীমনস্তত্ত্বের সঙ্গে কবির সহানুভুতিপূর্ণ যথাযথ পরিচয়ের নৈপুণ্য। দুঃখের সঙ্গে কবির আন্তরিক সৌহার্দ্য। এজন্য কেবল ফুল্লরা ও খুল্লনার বর্ণনেই নয়, অবমানিতা লহনার আন্তর্জ্বআলাময় বেদনার পরিচয় গ্রন্থনেও কবিকঙ্কণের কাব্যনৈপুণ্য সমধিক পরিস্ফুট হয়েছে।পরবর্তী বিখ্যাত ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই উদার সহানুভুতি তেমন নেই, আর কবিকঙ্কণ যেখানে লৌকিক বাঙলা ভাষার প্রকাশশক্তি উদ্‌ঘাটনে যত্ব নিয়েছেন, ভারতচন্দ্র সেক্ষেত্রে ভাষার কৌশলেই মনোযোগী হয়েছেন।

কবিকঙ্কণ একান্তভাবে সমাজনিষ্ঠ সাহিতিক। ব্যক্তির কথা বলতে গেলে সমাজ আপনা থেকেই তাঁর লেখনীমুখে ধরা দেয়। বস্তুত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রিক অথবা সামাজিক পরিবেশের অন্তর্নিবিষ্ট ক'রে ছাড়া কবি যেন এককভাবে বিবেচনা করতেই চান না। এই হিসাবে কালকেতু যখন ব্যাধ তখনও ফুল্লরা তাকে দুরন্ত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্টের নির্যাতনের ভয়ের কথা স্মরণ করিয়া দিয়েছে-

*শিয়রে কলিঙ্গ রায় বড় দুরাচার।*

কবি তখনকার দিনের শাস্ত্রিক ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর হলেও মুসলিম সমাজ সম্পর্কে সহানুভূতিপূর্ণ

অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। বলেছেন উচ্চ নিম্ন নানা সম্প্রদায়ের মুসলমান জন যেমন অন্তরের দিক থেকে সরল তেমনি নিজ ধর্মে অবিচল-

*বড়ই দানেশ মন্দ  না জানে কপট ছন্দ*
*প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ে।*

গুজুরাটে নগর পত্তন এবং বিভিন্ন জাতের প্রজাদের বাসভূমি ও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে কবি মুকুন্দ মুসলমানদেরই অগ্রগণ্য বিবেচনা করেছেন। এটি লক্ষ্যণীয়।তবে এমনও হতে পারে যে মোগল প্রশাসনের অন্তর্গত জমিদার রঘুনাথ রায় এ বিষয়ে কবিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অংশের এবং অন্যত্রও কবি মুসলিম সমাজ সম্পর্কে আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। কেবল্ রাষ্টিক কারণেই নয়,এই সব মানবিক কারণের মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তীব্রতা ছিল না। সাম্প্রদায়তার দৃষ্টি আজকালকার রাজনীতির অবদান,স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে এর প্রারম্ভ। আর সেই সঙ্গে ধর্মান্ধতারও।

কবিকঙ্কণের আর এক সামাজিক বৈশিষ্ট্য নিপীড়িত কৃষকজীবনের পরিচয় গ্রথিত করার মধ্যে।কলিঙ্গে বন্যা হলে কৃষকেরা যে গুরুতর দুর্বিপাকের মধ্যে পড়েছিল তার বর্ণনার কবি বলেছেন-

*বুলন মণ্ডল বলে শুন প্রজা ভাই।*
*হাজিল বিলের শস্য তারে ভয় নাই।।*
*মসাত করিবে রাজা দিয়া খাট দড়ি।*
*প্রথম মাই সরে চাহি এক তেহাই কড়ি।।*

অর্থাৎ শস্য গেল দৈবের কারণে, কিন্তু রাজা খাজনা তো ছাড়বে না।বরং মাপে ছোট দড়ি দিয়ে জমির পরিমাণ বেশী দেখাবে, আর তিন কোয়ার্টারে রাজস্ব শোধ বিষয়ে কড়া নিয়ম রক্ষা ক'রে আগামী ইগ্রহায়ণেই তিন ভাগের একভাগ চাইবে। বরং এই নদী বহুল দেশ ছেড়ে গুজুরাট যাওয়া যাক।সেখানে নোতুন জমিদার তিন বৎসরে খাজনা পরিশোধের নিয়ম করেছে-

*এদেশে বসতি নহে, ঘর নদীকুলে।*
*হাজয়ে সকল শস্য বরিষার কালে।।*
*তেসনী ইনাম পাব গুজুরাট যাই।*

মুখ্য কৃষক বুমন মণ্ডলকে কালকেতু আবাসনকল্প যে সব ছাড় দিতে চেয়েছে তার দৃষ্টান্তে এই প্রমান হয় যে বাৎসরিক অবশ্য দেয় মোটা রাজস্ব ছাড়া অন্য বহু আবওয়ার থেকেও কোথাও কোথাও প্রজাদের রেহাই ছিল না-

*আমার নগরে বৈস  যত ভূমি চাষ চষ্য*
*তিন সন বই দিহ কর।*
*হালে হালে এক তঙ্কা কারে নাহি কর্‌য শঙ্কা*
*পাট্রায় নিশানি মোর ধর।।*

অর্থাৎ এক হালের চাষে ( প্রায় দশ বিঘায় ) মাত্র এক টাকা খাজনা লাগবে।তাও তিন বৎসরের মধ্যে দিলেই চলবে।তা ছাড়া-

*নাহি লব বাউড়ি  রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি*
*ডিহিদার নাহি দিব দেশে।*
*সালামি বাঁশগাড়ি  নানা বাবে যত কড়ি*
*নাহি লব তো সভার পাশে।।*
*পার্বণী পঞ্চক যত  গুড়া, লোণা, সানাউত,*
*ধান্যকাটি কমসে-কসুরে।*
*যত বিচ চাউল ধান  তার নাহি লব দান*
*অঙ্ক নাহি বাড়াইব পূরে।।*

বাউড়ি অর্থাৎ বেশিরকম সুদবুদ্ধি,সেলামি, জমির দখল নেওয়ার সময় বাঁশগাড়ি কর,পার্বণী, পঞ্চক বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ আরও যোগ, গুড়, নুন প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য কর,সানাউত অর্থাৎ পুরানো মুদ্রা ব্যবহারের জন্য দেয় বাট্রা এবং ধান্যকাটি অর্থাৎ ফসল কাটার কর-এসব গুজুরাটে নেওয়া হবে না। বোঝা যায় তখনকার বেশ কিছু জমিদার ঐভাবে প্রজাশোষণ ক'রে কৃষকদের দুর্গতির একশেষ করত। কিন্তু এ  প্রসঙ্গে তুলনা ক'রে দেখতে হয় যে ইংরেজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে কৃষক প্রজাদের উপর যে পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে (যার ফলে কৃষক পরিবার ভিটেমাটি ছেড়ে কলে মিলে চা-বাগানে মজুরের কাজ নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে ) তার তুলনায় মধ্যযুগের কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত সুখীই ছিল।অসুবিধা হ'লে তারা এক জমিদারের

অধীন না থেকে অন্যত্র চ'লে যেতে পারত।আবার বলি, কবি মুকুন্দ দেখিয়েছেন যে, দরিদ্র ও কৃষক পরিবারের সাংসারিক জীবনে অর্থাৎ দাম্পত্যমূলক পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে সুখ ও শান্তি ছিল তা ধনীদের জীবনের ছিল না।

কবিকঙ্কণের কাব্য থেকে সেকালের রাষ্টিক অর্থাৎ জমিদারতান্ত্রিক প্রশাসনেরও একটি চিত্র ফুটে উঠেছে। পাঠান-মোগল প্রশাসনে জমিদারদের বিন্যাস ছিল মোটামুটি তিন শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীতে পূর্বেকার আমলের বংশানুক্রমিক রাজারা, যেমন,মল্লভূম-রাজ, কোচবিহার-রাজ , ত্রিপুরা-রাজ, চন্দ্রদ্বীপ-রাজ প্রভৃতি। যেমন হয়ত ছিলেন কলিঙ্গরাজও । প্রশাসনে এঁরা সম্রাটের কাছে বাৎসরিক একটা উপঢৌকন পাঠাতেন আর সৈন্য ও রসদ যোগাতেন। এদের নিচে ছিলেন বড় বড় জমিদারেরা। তাঁরাও সাধারণ্যে রাজা ব'লে খ্যাত ছিলেন,যেমন দিনাজপুর ও রাজশাহীর জমিদার, বীরভূম, (বির=জঙ্গল,সাঁও ), বর্ধমান, নদীয়ার জমিদার এবং প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, মধু রায়, সীতারাম রায় প্রভৃতি । এদের নিচে ছিলেন ছোটখাট জমিদার, ছোটবড় তালুকদার বা চৌধুরীরা। বাঙলায় এদের সংখ্যা ছিল বিস্তর। মোগল-প্রশাসনে একটা মূল বা উচ্চস্তরের ব্যবস্থা থাকলেও প্রজাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল এই সব জমিদার তালুকদারের সঙ্গে এবং তাঁদের নিযুক্ত নায়েব, তথশীলদার ও গ্রাম-প্রধানের সঙ্গে।যাই হোক সেকালে, রাজা বা জমিদারদের এলাকা নিয়ে প্রজা নিয়ে কলহ-বিবাদ ছিল, যুদ্ধও হ'ত, যুদ্ধের সময় কৃষক এবং অন্ত্যজ ও অরণ্যচারী সাঁওতাল-কোল সম্প্রদায় থেকে সৈন্যও সংগ্রহ করা হ'ত। কিছু হাতি-ঘোড়া সামান্য কয়েকটা বন্দুক এবং বিশেষভাবে ধনুর্ধারী পদাতিক সৈন্যেরই ব্যবহার ছিল।কবি মুকুন্দ কলিঙ্গরাজের সঙ্গে কালকেতুর কলহে তখনকার দিনের যুদ্ধের পদ্ধতি, পুলিশ, কারাগার এবং বন্দীত্বের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন।আরও দেখিয়েছেন যে কোনো জমিদারের রাজা হয়ে বসার মধ্যে মুখ্য প্রজাদের ও ভুঁইয়াদের সমর্থন আবশ্যক ছিল। এইসব নানা দিক বিবেচনা ক'রে দেখতে হয় যে মধ্যযুগের এই কবি তখনকার বিভিন্ন জাতির মানুষের বৃত্তিবিন্যাস-সহ রাষ্ট্র ও সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়ে কেবল মুখ্য কবি হিসাবেই নয়, সমাজ-ইতিহাসকার হিসাবে আজও স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

# কবিকঙ্কণের গ্রামত্যাগের কারণ ও তাঁর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল

কিছুকাল পূর্বে আমি কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহৃত তদ্ভব ও সংস্কৃতমূল নয় এমন শব্দসমূহের সঞ্চয়নে ও টীকা রচনার প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।যেখানে কবি স্বগ্রামত্যাগের কারণ বর্ণনা করছেন সেখানে রয়েছে 'উজীর হল্য রায়জাদা' 'উজীর' শব্দের যথাযথ অভিধা জানবার জন্যও বটে, আবার এই সব অংশ ছাত্রদের পড়াতে হয় বলেও বটে, উজীর পদের নির্দিষ্ট কর্তব্য কী ছিল এবং উক্ত বাক্যে 'উজীর' ও 'রায়জাদা' এ দু'টি শব্দের মধ্যে কোন্‌টি উদ্দেশ্য কোন্‌টিই বা বিধেয় তা নির্ণয় করতে না পেরে আমি ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করতে বাধ্য হই।বলা বাহুল্য, কবি মুকুন্দ-সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের ইতিহাস বা ব্যাখ্যাগ্রন্থে এইসব সমস্যা সমাধান দেওয়া হয় নি। ছাত্রজীবনে চণ্ডীকাব্য যখন আমাদের পাঠ্য ছিল তখন কবির আত্মবিবরণীর এ সব অংশ সম্বন্ধে জোড়াতালি দেওয়া একটা আইডিয়া মনের মধ্যে শিথিলভাবে গাঁথা ছিল।এখন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করতেই আমার দৃষ্টি খুলে গেল।বুঝলাম ঐ অংশের অর্থ হবে,রায়জাদা অর্থাৎ রায়ের পুত্র উজীর পদে নিযুক্ত হলেন।তখন মনে সংশয় উপস্থিত হ'ল,সুবাদারের নিম্নেই যে রাজকর্মচারীর স্থান,সুবার প্রধান রাজকর্মচারী ও অর্থসচিব যিনি, তিনি যদি হিন্দু হন, স্বয়ং সুবাদার মানসিংহ যদি হিন্দু হন,তাহ'লে আকবরের মত সম্রাটের শাসন "বিধমী"র অত্যাচারে কবি নির্যাতিত ও বিতাড়িত হলেন কিভাবে? অথচ সাহিত্যের ইতিহাসের পথিকৃৎ ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই একবাক্যে এরূপ আভাস দিয়েছেন যে বাঙলাদেশে অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে বিধর্মী রাজা ও রাজকর্মচারীরা লোক নির্যাতন আরম্ভ করেছিলেন এবং অত্যাচারে জর্জরিত হওয়ায় মুকুন্দকবিকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল।কবির গৃহত্যাগ যে অত্যাচারের জন্যই হয়েছিল, আর এই অত্যাচার যে মুসলমান রাজার ও কর্মচারীর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার, এই অনুমানের সমর্থনকল্পে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন,যিনি তার স্মরণীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির বিষয় ভাবাকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করেছেন, তিনি এক জার্মান পর্যটকের লোকমুখে শ্রুত বিবরণকে আকবরের শাসনকালে হিন্দুর উপর অত্যাচারের নজির হিসাবে উপস্থাপিত করতে দ্বিধা করেন

নি।আবার এই ধরনের অত্যাচার কল্পনা ক'রে এবং গৃহত্যাগের ঘটনার উপর নির্ভর ক'রে একজন সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার কবির মাত্র কয়েকদিনের দুঃখ দুর্বিপাককে অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছেন-"মুকুন্দরামকে জীবনে অনেক দুঃখভোগ করিতে হিয়াছিল"।এরপর কবির কাব্যবস্তু সম্পর্কে আলোচনায় দুঃখবাদ, নৈরাশ্যবাদ প্রভৃতি তত্ত্বকথার বহু কোলাহল উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু কবির আত্মপরিচয়ের ঐ অংশ পাঠ ক'রে, ঘটনাসমূহের একেবারে অন্তঃস্থলে প্রবেশ না করেও সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারদের চিত্তে অত্যাচার উৎপীড়ন অনুমান বিষয়ে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। এ কেবল আকবর ও তাঁর প্রতিনিধি মানসিংহের সম্ভাব্য সুশাসনের দিক থেকেই নয়,উজীর থেকে একেবারে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ডিহিদার পর্যন্ত সংঘবদ্ধভাবে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে প্রজাপীড়ন করবেন এ অবিশ্বাস্য। কিন্তু সন্দেহ-সংশয় যে একেবারে ঘটে নি এমনও নয়।এর সমাধানের জন্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারেরা বিবিধ কল্পনার আশ্রয় গ্রহন করেছেন। আত্মপরিচয়ে মানসিংহের উল্লেখের কোনও মর্যাদা না দিয়ে অথবা এ কবির পূর্বাপর অসংলগ্ন ভাষণ এরূপ ধারণার প্রশ্রয় দিয়ে তাঁরা এই কল্পিত বিশৃঙ্খলার সময় বিন্যাস করতে চেয়েছেন মোগল অধিকারের একেবারে প্রারম্ভ-কালে ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে অথবা এমনতর পশ্চাতে সে একেবারে সুরবংশের পতনের সময় ১৫৬৩-৬৪ অব্দে,এমনকি তারও কুড়ি বছর আগে।কয়েকটি ক্ষেত্রে 'ডিহিদার' শব্দের অর্থ ও সামর্থ্যের বোধে বিঘ্ন হওয়ায় "রাজা হৈল মহম্মদ শরিফ" এরূপ বিকৃত পাঠের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে 'মহম্মদ শরিফ' নামক ব্যক্তিকে ইতিহাসে কোথায় পাওয়া যায় তা সন্ধান ক'রে মুকুন্দকবির গ্রামত্যাগ ও কবিত্ব-প্রাপ্তির কালকে ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বে স্থাপন করতে সাহিত্যের ইতিবৃত্তকারদের কোনও অসামঞ্জস্য অনুভূত হয় নি।

ইতিবৃত্তকারদের এরকম কম্পনার উত্তাপে ইন্ধন জুগিয়েছে মুকুন্দের কবিত্বপ্রাপ্তির কালজ্ঞপক একটি প্রচলিত পয়ার।সেটি হ'ল-"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা।" এটি ১৫৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দকেই নির্দেশ করে। এর ঠিক পূর্বেই আফগান কর্‌রানি বংশের শেষ ও মোগল অধিকারের সূচনা।সন্ধিক্ষণ হিসাবে বেশ কল্পনা করা যেতে পারে যে গৌড়ে বিশৃঙ্খলা চলছিল।ঐ কালজ্ঞাপক পয়ারটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেও কোনও কোনও ইতিবৃত্তকার বিশৃঙ্খলা-কম্পনার সঙ্গে মিলিয়ে অবশেষে সেটিকে মান্য করেছেন।লক্ষণীয় এই যে, ঐ কালজ্ঞাপক পুষ্পিকাটি কবিকঙ্কণের চন্ডীকাব্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থেই (১৮২৪ খ্রীঃ) পাওয়া গিয়েছিল,কিন্তু কোনও পুঁথিতেই এই কালনির্দেশ দেখা যায় নি।মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় এরূপ কালজ্ঞাপকতার মূল্য যে কী তা ইতিবৃত্তকারেরা ভালো করেই জানেন। অন্যবিধ সুদৃঢ় প্রমাণের সঙ্গে না মিললে ঐরূপ নির্দেশ বিশ্বাসের যোগ্য নয়। কারণ, পুরানো পালাগায়কেরা এবং লিপিকারেরা পুঁথির আসল পাঠের বহুতর বিকৃতি ঘটিয়েছেন। তবে যে মুকুন্দকবির ক্ষেত্রে

এর বহুমান করা হয়েছে তার কারণ ইতিবৃত্তকারদের চিন্তায় কবি-বর্ণিত বিশৃঙ্খলা আর কখনই বা সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়ের ব্যাপার আছে।বর্ধমান জেলার গেজেটিয়ারে ইতিবৃত্ত অংশে মুকুন্দের কাব্যরচনায় সময় যদিই বা 'Circa 1600' ধরা হয়েছে,তবু ইতিবৃত্তকার স্বচ্ছন্দে বলেছেন যে শাসন-শৃঙ্খলার অভাবে কবি অত্যাচারীর দ্বারা নিপীড়িত হয়েছিলেন।অথচ ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যায় ১৫৭৬ খ্রীঃ পরে আফগান জায়গীরদারদের সঙ্গে মোগলদের ইতস্ততঃ সংঘর্ষ হতে থাকলেও ঐরূপ কর্মচারী-প্রজা-সংঘর্ষ হয় নি। ঐরূপ সুবিন্যস্ত অফিসার শ্রেণীও ছিল না।বিশৃঙ্খলার সময় উজীর বা ডিহিদারের নবনিয়োগের ব্যাপারও ঘটতে পারে না। ১৫৯০-এর মধ্যে মান্দারন সরকার (বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে)মোগল সৈন্যের সঙ্গে আফগান সরদারদের সংঘর্ষে কত্লু খাঁ নিহত হলে রাঢ়সহ গৌড়ে কলহ স্তব্ধ হয়।এরপর মানসিংহ ওড়িষ্যা জায়গীরদারদের বশীভূত ক'রে সেখানে মোগল আধিপত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৯৩ খ্রীঃ )।এরপর বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের পালা।মানসিংহ পাকাপাকিভাবে বাঙ্লা-ওড়িষ্যার সিপাহ্-সালার নিযুক্ত হয়ে আসার পরই (১৫৯৪ খ্রীঃ)বঙ্গে মোগল-বিজয় সমাপ্ত করতে অগ্রসর হন এবং ১৫৯৫ এ ঈশা খাঁর বশ্যতা স্বীকারের পর অনেকটা সফলকামও হন। কবিকঙ্কণের প্রশস্তি অনুসারে এই সময়কার মানসিংহকেই যথার্থভাবে "গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ" বলা যায়।ইতিহাস বলে, মুজফ্ফর খাঁর কর্তৃত্বের সময় বাঙলা ও বিহারে মোগলদের অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও জায়গীরদারদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছিল।কিন্তু তোড়রমলের হস্তক্ষেপে এবং শাসনকৌশলে এ বিদ্রোহ প্রশমিত হতে বিলম্ব হয় নি এবং ১৫৮২ খ্রীঃ মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লব প্রশমিত হয়।এ বিপ্লবের কালে প্রজাদের কোনও অসুবিধা হয়েছিল এমন কথা 'আকবর-নামা' গ্রন্থে পাওয়া যায় না।এর পূর্বে কররানি বংশের শাসনকালে তো বাঙ্লায় সুখসমৃদ্ধিরই অবস্থা।সুলেমান কর্রানি সুযোগ্য শাসক ছিলেন এবং দায়ুদ ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা হঠকারী হলেও প্রজাপক্ষে নির্দয় ছিলেন না। শেরশাহের সময় যে উন্নত শাসনব্যবস্থা,মুদ্রামান এবং ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়েছিল,কর্রানি বংশ পর্যন্ত তা একটানা চলে এসেছিল।তোড়রমল এরই উপর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কিছু সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন। এর মধ্যে কর্মচারীদের সর্বেসর্বা হয়ে প্রজাপীড়ন করার কোনও সুযোগই ছিল না।ডঃ কানুনগো তাঁ 'শেরশাহ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শেরশাহের শাসন জায়গীরদার ও তালুকদারদের প্রতিকূল ছিল,কিন্তু সর্বথা প্রজাকল্যাণের অভিমুখী ছিল।আকবর ও তোড়রমল নির্দিষ্ট এবং মানসিংহ কর্তৃক সার্থকভাবে অনুসৃত নীতিতেও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রজার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্বীকৃত হয়েছিল।এর জন্যই শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহের যন্ত্রটিকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।শেরশাহ ও তৎপুত্র ইস্লাম শাহ জায়গীরদারদের প্রবল প্রতাপ কতকটা খর্ব করে এনেছিলেন, কিন্তু প্রজার সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগ সম্পূর্ণ করতে পারেন নি।এর জন্য সুযোগ্য শাসক, সুদক্ষ কর্মচারী-ব্যূহ এবং সম্ভবতঃ অর্থেরও প্রয়োজন ছিল। কাবুল কাশ্মীর থেকে গৌড়

এলাকা পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত মোগল মুদ্রা প্রচলন ও খুত্‌বা পাঠের দ্বারা বশীকৃত করার পর আকবর মোটামুটি ঐক্যমূলক প্রশাসন পদ্ধতি ও নির্দ্বন্দ্ব রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে মনোযোগী হন । ১৫৮২ খ্রীঃ তোড়রমলকে বাঙলা বিহার থেকে ফিরিয়ে এনে আকবর সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করেন । ১৫৮৬ খ্রীঃ আকবরের বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত সুবার সমমর্যাদার নূতন অফিসার শ্রেণী নিয়োগের ব্যবস্থা হতে থেকে।এর ফলে গ্রাম থেকে আরম্ভ ক'রে পরগনা, সরকার,সুবা কেন্দ্রের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়।প্রজাদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায়,প্রশাসন,বিচার প্রভৃতি সমস্তই এই নূতন সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়। কেন্দ্রীয় প্রধান কর্মচারীবর্গের সহায়তার আকবর নূতন শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচনার চেষ্টা করেছিলেন যাতে ঐ তিনটি অংশ শিথিলভাবে সংলগ্ন না হয়। বিশেষ প্রয়োজনে হয়ত রাজস্ব সমাহরণ এবং প্রশাসনের ভার একই পদে ন্যস্ত করা হয়েছিল।কিন্তু সমাহর্তা ও প্রশাসক ভিন্ন হলেও পারস্প্ররিক সহযোগীতায় দায়বদ্ধ ছিলেন।আকবর-নামায় এই নবনিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দের নিম্নলিখিত রূপ আখ্যা দেখা যায় ।

(১)সিপাহ্‌-সালার বা সুবাদার (২)ঊজীর (শেরশাহের আমলের 'দেওয়ান'-স্থলে বোধ হয় অল্পস্বল্প অধিকার ও মর্যাদার পরিবর্তন ক'রে)(৩)বক্‌শী (Accountant General-এর মত)(৪)সদর (বিচারক) (৫)আমল গুজার (রাজস্ব সমাহর্তা)(৬)কোতোয়াল (নগররক্ষী) (৭) ফৌজদার (সরকার এলাকার Criminal Magistrate ) (৮)কাজী (সরকার এলাকার বিচারক ) (৯)শিকদার (পরগনার Criminal Magistrate) (১০)পোতদার (মুদ্রা ও ধাতু বিষয়ে অভিজ্ঞ খাজাঞ্চী)এবং কানুনগো,পাটোয়ার,সরকার এবং সম্ভবতঃ গ্রাম-প্রধান ডিহিদারও। ঐ পদের অনেকগুলি যদিও শেরশাহের সময় থেকে বিদ্যমান ছিল, এখন শাসনকার্যের সুবিধার জন্য অধিকার ও মর্যাদার কিছু অদলবদল করা হ'ল।কেউ কেউ নূতন পদে নূতন আখ্যাও লাভ করলেন।'ডিহিদার' পদের বিষয় 'আকবর-নামা'য় উল্লিখিত নেই,সর্বনিম্ন পদ বলেই বোধ হয় নেই।'ডিহ্‌' শব্দের ফারসীতে মূল অর্থ গ্রাম।ডিহিদার হ'ল গ্রাম-প্রধান। শেরশাহের সময়কার 'মকদ্দম'-এর তুল্য পদ।একটু পার্থক্যও হয়তো বা করা হয়েছিল।ছোট বড় দু-চারটি গ্রাম যুক্ত ক'রে এক একটি ক্ষুদ্রতম রাজস্ব-অঞ্চল।গ্রামের সঙ্গে তার প্রধানকেও এই নূতন 'ডিহিদার' আখ্যা দেওয়া হতে পারে। বৈশিষ্ট্য এই যে মোগল-শাসনে ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত রাজকর্মচারীই বেতনভোগী হলেন।

কবি মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে তিনি যে রাষ্ট্রিকতার ছবি তুলে ধরেছেন তা এই নববিধানের । তাতে তিনি সুবেদার ,উজীর, পোতদার,সরকার এবং ডিহিদারের উল্লেখ করেছেন।প্রজারা এই নূতন ব্যবস্থার জন্য এবং কর্মচারীদের কঠোর নিয়মানুবর্তীতার সঙ্গে পূর্বে পরিচিত ছিলেন

না। তাঁরা ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা তালুকদারের বা জায়গীরদারের কাছে এবং জায়গীরদারেরা সদরে দেওয়ানের কাছে রাজস্ব জমা দিয়ে নির্বিবাদে সম্পত্তি ও অর্থ ভোগ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই-ই ছিল প্রথা। মোগল- শাসনের এই নোতুন ব্যবস্থায় কিন্তু রাজ্যসরকারে প্রজাদের সরাসরি খাজনা জমা দেওয়ার নির্দেশে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হলেন ভূম্যধিকারীরা।প্রজারা সাময়িকভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হলেন মাত্র।তবু প্রজাদের দুর্ভোগ কম হয় নি।জমির পুরনো মাপের স্থানে নোতুন মাপের ও নোতুন পড়্চার প্রবর্তন, মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্রার জন্য ক্ষতি,পুরাতন মুদ্রা দেওয়ার তারিখ পার হলে প্রতিদিনের জন্য জরিমানা এবং সর্বোপরি কড়া হুকুম প্রজাগণকে সাময়িকভাবে বিব্রত করে তুলেছিল।তোড়রমল সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর নিযুক্ত হয়ে রাজকার্যের যাবতীয় রেকর্ড ফারসীতে লিখিত হওয়ার নির্দেশ ঘোষণা করেন। এটিও প্রজাদের গুরুতর অসুবিধার কারণ হয়ে থাকবে।আমাদের কবি এই নোতুন পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হয়েছিলেন। এটি ১৫৯৫-এর আগে হতে পারে না। সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবরের নির্দেশনামা ১৫৮৬ খ্রীঃ প্রদত্ত হলেও  বাঙলায় তখনই এই ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। ১৫৮৯ খ্রীঃ তোড়রমলের মৃত্যুর পর কুলিজ খাঁ সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর নিযুক্ত হলে তিনি অতিরিক্ত কর্মভারের কারণে সুবাগুলিকে চারভাগে বিভক্ত ক'রে প্রত্যেক বিভাগের জন্য এক একজন সহায়ক প্রধান উজীর নিয়োগের প্রার্থনা করেন।এইভাবে উজীর পদের কয়েকটিতে অদল বদল হয়।বাঙলার শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁ নববিধান প্রবর্তনের উপযুক্ত সুদক্ষ শাসকও ছিলেন না।এই সময় মানসিংহ বিহারের সুবাদার, এবং সেই সঙ্গে তিনি ওড়িষ্যা অধিকারের জন্য সংগ্রামও পরিচালনা করছেন ।ওড়িষ্যার জায়গীরদারদের বশীভূত ক'রে দিল্লী গেলে সেখান থেকে তিনি বাঙলা ও ওড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন ১৫৯৪- এর মধ্যভাগে।তিনি যেমন দেশজয় তেমনি সংগঠনেও সুদক্ষ ছিলেন।বাঙলা-ওড়িষ্যায় এই দুই কার্যেরই প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য সুবেদার রূপে মানসিংহ নির্বাচিত হলেন এবং সৈয়দ খাঁ তাঁর স্থানে বিহারে প্রেরিত হলেন। আকব্র-নামা গ্রন্থে দেখছি দিল্লীতে-

"The collectors of khalsa ,the file-holders and the assayers of the mint were summoned and a proper test and just weight were assigned to the coins. On the 27th April 1594, the charge of this work was given to Khwaja Shamsuddin . His disinterestedness and laboriousness remedied in course of two months the old disease of gold and silver ..... on 15th of  May 1594 Raja Mansingh was sent to Bengal with weighty counsels in order that he might carry out the royal regulations."

সুবাগুলিতে নোতুন উজীর নিয়োগের ব্যাপারও ১৫৯৫ খ্রীঃ- এর পূর্বে ঘটেনি।এ সম্বন্ধে 'আকব্র-নামা'-

"On 11th July 1595 twelve Diwans were appointed . Though the vizier-ship was prosperously conducted by the truthfulness and industry of Khwaja Shamsuddin Khafi, yet on account of excess of business and of farsighted-ness a vizier was appointed to every province and former wishes became fact. Hussain Beg was appointed to Allahabad, Bharti Chand to Azmere , Rai Ram Das to Ahmedabad, Kahum to Oudh ,Kishu Das to Bengal, Ram Rai to Delhi etc. An order was given that every one should report his proceedings to His Majesty in accordance with the advice of the Khwaja."

বাঙ্লায় নোতুন উজীরের যোগদান করতে এবং আন্যান্য কিছু কিছু নোতুন কর্মচারী নিয়োগের পর জমি-জরীপ ,মুদ্রা বিনিময়, রাজস্ব ও কর নির্ধারণ প্রভৃতিতে ১৫৯৬ খ্রীঃ ও অতীত হওয়ার কথা। ইতিমধ্যে পূর্ববঙ্গে মানসিংহের অধিকার বিস্তারও সুসম্পন্ন হয়।

আকবর-মানসিংহের সময় বাঙ্লায় এই শাসন-সংস্কার কীভাবে প্রারব্ধ হয়, 'আইন' অথবা 'আকবর-নামা'য় তার কোনও বিবরণ নেই, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মঙ্গলকাব্যের এই খ্যাতনামা কবি স্বল্প পরিসরে এই প্রশাসন ও ভূমি সংস্কারের পদ্ধতিটি উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন।এ তাঁর ও অন্যান্য গ্রামীণ প্রজাদের কাছে দুর্বিপাক রূপেই দেখা দিয়েছিল। কিন্তু নোতুনের আগমনে এইরকমই হয়ে থাকে।প্রশ্ন হতে পারে কবি দামিন্যা গ্রাম ত্যাগ ক'রে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে ঘাটালের নিকটবর্তী ব্রহ্মণ্যভূমি বা আরড়ায় গিয়ে পরিত্রাণ লাভ করলেন কিভাবে? এর উত্তরও ইতিহাস দিচ্ছে।এখন যা মেদিনীপুর জেলা তার উত্তর-পশ্চিমের কিয়দংশ মান্দারন সরকার অর্থাৎ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।(মধ্যে কত্লু খাঁ কিছুদিনের জন্য মান্দারন সরকারকেও ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহ ওড়িষ্যার জায়গীরদারদের মোগল আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। কিন্তু তিনি আরও অগ্রসর হয়ে শাসন স্ংস্কারের দ্বারা তত্রত্য আফগান ও হিন্দু 'রাজা'দের অধিকার খর্ব করতে চাইলে খুর্দা-রাজ রামচন্দ্র প্রমুখ প্রধান ভূস্বামীগণ আকবরের কাছে আবেদন করেন এবং আকবর মানসিংহকে এ বিষয়ে নিরস্ত হতে বলেন । ফলতঃ ওড়িষ্যার পূর্বতন জায়গীরদারী শাসনপদ্ধতি কিছুকালের জন্য অটুট থাকে।সেই পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থা,সেই স্বর্ণমুদ্রা-রৌপ্যমুদ্রা, দাম-কৌড়ির মুদ্রামান শুধু

আকবর বাদশাহের নাম-সহ চলতে লাগল।গৃহত্যাগের সময় কবি পুরাতন মুদ্রা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।পুরাতন ব্যবস্থায় লালিত এবং হিন্দু তালুকদারের অধীনে অভ্যস্ত কবি এখানে তাঁর মনোমত পুরাতন রাষ্ট্রের আশ্রয় পেয়ে চরিতার্থ হলেন।মুকুন্দকবি যাঁর আশ্রয় লাভ করেন তিনি বিখ্যাত কোনও রাজা বা জায়গীরদার নন,সাধারণ ভূস্বামী মাত্র।তাঁর নাম বাঁকুড়া রায়। তিনি সপরিবারে কবিকে অভ্যর্থনা করলেন,সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ আড়া অর্থাৎ প্রায় দশ মণ ধান্য দিলেন এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন ('সুত পাছে কৈল নিয়োজিত')। কবি মুকুন্দ এই রঘুনাথ রায়ের ভূস্বামীত্বের কালেই তাঁর চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ করেন ও পরিসমাপ্ত করেন ।কিন্তু এঁদের পরিচয় বা ভূস্বামীত্বের কাল সম্পর্ক ইতিহাস কোনও সাক্ষ্য দেয় না।ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেছেন,তৎকালীন মেদিনীপুরের এক ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নাকি অনুসন্ধন ক'রে তাঁকে জানিয়েছিলেন যে,রঘুনাথ রায় ১৫৭৬ খ্রীঃ-১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন,কিন্তু কীভাবে তিনি এই তারিখ নির্ধারণ করেন তা জানাননি।অথচ ঐ তারিখ আকবরের বঙ্গবিজয় ও মৃত্যুর কালের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে।সুতরাং ঐ তারিখের উপরও আস্থা স্থাপন করা যাচ্ছে না।আসলে ওটি রঘুনাথের পিতা বাঁকুড়া রায়ের ভূস্বামী থাকার কাল।

মুকুন্দকবি তাঁর গৃহত্যাগের কারণস্বরূপ যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা অত্যাচারের বা মাৎস্যন্যায়ের নয়, কবিও বিতাড়িত হন নি।তাঁর তালুকদার গোপীনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হওয়ার পর তাঁর নিজের ভূসম্পতি সম্বন্ধেও খানিকটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, নোতুন জরীপের ফলে হয়ত জমির আয়তন ও অধিকার সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন,তারপর বিনিময়-মানে আফগান শাসনের পুরাতন মুদ্রা নিহিত ধাতব মূল্যে গৃহীত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মধ্যেও পড়েছিলেন।অতএব কেউ কেউ যেরকম পলায়ন করছে, সেইভাবে লুকিয়ে চলে যাওয়াই সাব্যস্ত করলেন। আত্মপরিচয়ে তিনি যে পথনির্দেশ দিয়েছেন তা সদর পথ নয়।তিনি আত্মগোপন ক'রে পালিয়েছিলেন ব'লে পথে কষ্ট তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল।মুকুন্দকবির আত্মপরিচয় অংশটি সামগ্রিক বিচারে এবং খুচরো ব্যাখ্যায় ঠিকভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় নি ব'লেও তাঁর গ্রামত্যাগের মূল কারণ মুসলমানের অত্যাচার ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং তাঁর সাম্যয়িক দুঃখকে ব্যাপক ক'রে কম্পনা ক'রে তাঁর কাব্যে ঐ দুঃখের প্রতিক্ষেপ ঘটেছে কিনা তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে।আমরা এখানে মুকুন্দকবির আত্মবিবরণের অংশটুকু বিচার ক'রে আমাদের ধারণার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে অগ্রসর হচ্ছি।

বলা বাহুল্য, কবির আত্মপরিচয়ের বা কবিত্বলাভের বিবরণের এই অংশটি ("শহর সেলিমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ " ইত্যাদি)পালা গায়কদের নগণ্য পাঠভেদসহ সব মুদ্রিত গ্রন্থের

এবং বিভিন্ন অঞ্চলের পুঁথিতে পাওয়া যায়।সুতরাং ঐ অংশটি যোজিত আংশিক প্রক্ষেপ বলার অবকাশ নেই।কবির আত্মপরিচয়ের আর একটি অংশও ("ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে " ইত্যাদি) কয়েকটি গ্রন্থে প্রচলিত আছে। ১৯২৪ খ্রীঃ-এর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন ঐ অংশটিকে প্রাধান্য দিয়ে অগ্রে স্থাপন করেছিলেন। ঐ অংশে স্মৃতিতে বা সম্মুখে পরিবর্তী অংশের বক্তব্যের কোনও খণ্ডন নেই,নূতন কোনও ঐতিহাসিক বা সামাজিক তথ্যও নেই।সেখানে দামিন্যা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের এবং শেষে কবির আত্মগৌরব ঘোষণা করা হয়েছে।আমরা এই অংশটিকে দামিন্যা-দক্ষিণপাড়া গ্রামের কোনও পালাগায়কের যোজিত প্রক্ষেপ ব'লে মনে করি।কিন্তু এই প্রবন্ধে প্রক্ষিপ্ত বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয় ব'লে এ সম্বন্ধে বাগ্ বিস্তার না ক'রে মূল আত্মপরিচয় অংশের ইতিহাসানুগ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।এই আলোচনায় আমাদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত ও বর্তমানে প্রচলিত গ্রন্থের পাঠের গুরুতর কোনও প্রভেদ নেই ব'লে পাঠকদের ঐ অংশও সম্মুখে রাখতে অনুরোধ জানাই।প্রয়োজনীয় অংশগুলি মাত্র ব্যাখ্যাত হচ্ছে।

**'শহর সেলিমাবাজ'**- প্রভৃতির সেলিমাবাদ হ'ল সুলেমানাবাদ নামক সরকারের হেডকোয়ার্টার।সুলেমান কর্‌রানির নামানুসারে সুলেমানাবাদ, তা থেকে সেলিমাবাদ।রেনেল-এর মানচিত্র 'সেলিমাবাদ' ।এটির অবস্থান বর্ধমান থেকে প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের কাছে।সেলিমাবাদ থেকে দামিন্যা আট মাইলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে 'গোটান'-এর উত্তরে।সেলিমাবাদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম সোজা কুড়ি মাইলের মধ্যে জাহানাবাদ (বর্তমানে আরামবাগ)এবং আরামবাগ থেকে দক্ষিণ রূপনারায়ণের সংযোগস্থলের কাছে ব্রহ্মণ্যভূমি বা আরড়া (রেনেলের মানচিত্রে বমন্যপু-ই {ভূঁই}) ।দামিন্যা থেকে আরড়া সোজা পথে বাদশাহী সড়ক ধ'রে ও রূপনারায়ণের মধ্য দিয়ে ৩০/৩৫ মাইলের মধ্যে।

**'ধন্য রাজা মান সিংহ'** ইত্যাদি-কবিকর্তৃক এ উল্লেখ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কবি আকবর বাদশাহের উল্লেখ করেন নি,কারণ,অধীশ্বর হিসাবে মানসিংহই প্রত্যক্ষ এবং সর্বেসর্বা ।মানসিংহের পরিচয় ঐ অঞ্চলের সাধারণ প্রজারাও জানতেন, কারণ,সুবাদার হওয়ার পূর্বেই বাঙ্‌লা ও ওড়িষ্যায় আফগান প্রতিরোধ দূর করার জন্য সৈন্যসহ এবং সপরিবারে মানসিংহ কখনও বর্ধমানে,কখনও সুলেমানাবাদে কখনও বা জাহানাবাদে যাপন করতেন (আকবর-নামা দ্রঃ ) মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ,দুর্জনসিংহ প্রভৃতিও অন্তত নামতঃ সকলেরই পরিচিত ছিলেন। 'বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ' বলার নিকটতম কারণ এই যে ১৫৯২ খ্রীঃ মানসিংহ ওড়িষ্যা বিজয় ক'রে সপরিবারে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ ও প্রার্থনায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন।'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ' বলায়

বোঝা যায় এটি মানসিংহের ওড়িষ্যা এবং বঙ্গ বিজয়ের পরে লিখিত,অর্থাৎ, ১৫৯৫-এর পূর্বে নয়।'এমন বীর ও মহৎ রাজার সময়েও মামুদ শরিফের মত নিষ্ঠুর ব্যক্তি ডিহিদার নিযুক্ত হয়,এ প্রজাদের পূর্ব পাপেরই ফল বলতে হবে'-কবি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

**'ডিহিদার মামুদ শরিফ'**-ডিহিদার অর্থে গ্রাম-প্রধান। রাষ্ট্রতন্ত্রের নিম্নতম কর্মচারী।শেরশাহের সময়ে এরই আখ্যা ছিল 'মকদ্দম'।আকবরের সময়ে নোতুন নামকরণের মধ্যে নোতুন পদাধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।গ্রাম প্রধান ব'লে প্রজাগণের সঙ্গে এঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল।পদ ক্ষুদ্র হলেও ডিহিদার বা মকদ্দমের দায়িত্ব কম ছিল না।গ্রামের রাজস্ব আদায় থেকে ছোট খাট প্রশাসন ব্যবস্থা দিহিদারের উপরেই নাস্ত থাক্ত।গ্রামাঞ্চলে চুরি দাকাতি,খুনখারাপী হলে এবং অপরাধীর সন্ধান না মিললে এঁকেই কৈফিয়ত দিতে হত।

ডঃ কানুনগো তাঁর 'শেরশাহ' গ্রন্থে মকদ্দম পদের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।অপর একজন ঐতিহাসিক বলছেন- The Mughal and the earlier Muslim rulers used the headman of the old village community as not only an agent for revenue realization, but also held him officially responsible for policing of the rural areas.*

আবার ইনি গ্রামের সর্বেসর্বা হওয়ায় এঁর প্রতাপও কম ছিল না।কবিকঙ্কণের বর্ণনায় দেখা যায় প্রজারা যাতে না পালায় তার জন্য ডিহিদার সন্দেহের ক্ষেত্রে পেয়াদা লাগাচ্ছেন।প্রজা চলে গেলে রাষ্টের ক্ষতি।তখন দিহিদারকেই শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।তার উপর নোতুন শাসন প্রবর্তনের সময়। উপরওয়ালারা কড়া হওয়ায় ডিহিদারকেও কঠোরতা অবলম্বন করতে হয়েছিল।ব্যক্তিবিশেষের উপর তার রোষ বা পক্ষপাতের কথা আমাদের কবি বলেন নি।বরং প্রকারান্তরে গুণগানই করেছেন-'ডিহিদার অবুঝ খোজ, কড়ি দিলে নহে রোজ' ইত্যাদি রূপ বর্ণনা ক'রে।টাকা হাতে দিয়ে যার কঠোরতা প্রশমন করা যায় না এমন কর্মচারী সমাজের গৌরবই বলতে হবে।('রোজ' আরবী,অর্থ-প্রসন্নতা,সুখী)।

.....

*Saran- Provincial Govt of the Mughals

**‘উজীর হল্য রায়জাদা’**-অংশটি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এখানে রায়জাদা উদ্দেশ্য ও উজীর বিধেয়।‘রায়পুত্র উজীর পদে নিযুক্ত হলেন’ এরূপ অর্থ হবে।সুবাদারের পর উজিরই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্মচারী,যাবতীয় আয়-ব্যয়ের অধিকর্তা এবং সম্ভবতঃ প্রশাসনেরও আংশিক দায়িত্বযুক্ত।উজীর এবং দেওয়ান সমার্থবহ শব্দ ।শেরশাহের সময়ে ও আকবরের সময়েও এতকাল দেওয়ান শব্দ প্রচলিত ছিল।সম্ভবতঃ কিছু নোতুন মর্যাদা আরোপিত হ’লে উজীর শব্দটি নির্বাচিত হয়। কবি বলছেন,তিনি ব্যবসায়ীদের উপর খড়্গহস্ত হলেন এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সজ্জনের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন।নোতুন মাপ নোতুন ওজন এবং দ্রব্যশুল্কের হার নিয়ে ব্যবসায়ীদের সাময়িক বিপন্নতা স্বাভাবিক।কিন্তু কে এই রায়পুত্র? ‘আকবব-নামা’য় দেখা যায় পত্রদাস নামক এক ব্যক্তি রায়রায়াঁ খেতাব পেয়ে ১৫৭৯ খ্রীঃ বাঙ্লার যুগ্ম-দেওয়ানের একজন নিযুক্ত হয়েছিলেন।সম্ভবতঃ ইনি পশ্চিম থেকে তোড়রমলের সঙ্গে এদেশে এসে গৌড় বিজয়ে মোগলের সহায়তা করেন এবং তারপর থেকে এখানেই বসবাস করতে থাকেন। ঐ সময় মুজাফ্ফর খাঁ গৌড়ের শাসনকর্তা।বাঙ্লায় কিছুদিন দেওয়ানের কাজ করার পর ১৫৮৫ অব্দে রায় পত্রদাস বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত হন । ১৫৮৭ অব্দে মানসিংহ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হলে পর তৎপদে নিযুক্ত কুলিজ খাঁর সহকারী দেওয়ান হিসাবে তিনি দিল্লীতে চলে যান। ঐ সময় কেন্দ্রে বাঙলা-বিহারের প্রতিনিধি দেওয়ান ছিলেন রায় রামদাস (সম্ভবতঃ ভগবান দাসের পুত্র)।এ হল ১৫৯০-৯১ –এর কথা।আবার দেখা যায় মানসিংহ ১৫৯৩ খ্রীঃ পত্রদাসকে বাঙ্লায় ফিরিয়ে এনে ওড়িশ্যার বান্ধু দুর্গজয়ে প্রেরণ করছেন। মনে হয়,পত্রদাসকে বাঙ্লাতেই রেখে মানসিংহ এই সময়ে দিল্লী চলে যান এবং ১৫৯৪-এ বাঙলা-ওড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।এর পর থেকে পত্রদাসের কোনও খোঁজ মিলছে না । ১৫৯৫-এ দেখছি নোতুন শাসন-সংস্কারে ‘কিসু দাস’ বাঙলার উজীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। এই ‘কিসু দার’ পত্রদাসেরই পুত্র কিনা সে বিষয়ে আকবর-নামায় কিছু পাওয়া যায় না। মুকুন্দকবিও কোনও নাম করেন নি। আমাদের অনুমান এই কিসু দাস(কেসু দাস নয়, তিনি ভিন্নব্যক্তি)পত্রদাসের পুত্র –ঐ রায়জাদা। ঐ আখ্যাতেই তিনি বহু পরিচিত হয়েছিলেন।অযোগ্যতা প্রতিপন্ন না হলে সরকারি রাজকর্মে বংশক্রম রক্ষার একটা রীতি তখন ছিল। এতে কাজের সুবিধাও হত।যুবক উজীর, পূর্বপরিচিত রায়জাদা, অতি-উৎসাহ সহকারে সংস্কার কার্যে ব্রতী হয়ে ব্যবসায়ী ও সজ্জনবর্গের সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি ক’রে বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

**মাপে কোণে দিয়া দড়া**-কোণাকুণি দড়ি দিয়ে মাপলে কার কি সুবিধা হয় তা বোঝা যায় না।আয়তক্ষেত্র নয়, এমন ভূমির কালি বের করতে হলে ঐরূপ মাপের প্রয়োজন হতে পারে।উজীরের নির্দেশে জমির জরীপ খুব সূক্ষ্মভাবেই করা হচ্ছিল। এরূপ সূক্ষ্ম মাপে প্রজারা অভ্যস্ত ছিল না। এখনও দেখা যায়, নোতুন সেট্লমেণ্ট বসলে জমির মালিক অনেকেই অসুবিধা বোধ করেন।

**পনের কাঠায় কুড়া**- নোতুন মাপে জমির পরিমাণ কমে যেতে লাগল।এর কারণ ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরণের মাপ প্রচলিত থাকায় অসাধু ব্যক্তি অন্যকে ঠকাতো। আকবর সর্বত্র এক প্রকার মাপ প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়েছিলেন।বিঘা মাপ ছিল ৬০ গজ multiply ৬০গজ,কিন্তু আকবরের ইলাহি গজের দৈর্ঘ্য পূর্ব-প্রচলিত ইস্কিন্দারী গজ থেকে এক আঙুলের মত কম হওয়ায় বিঘার পরিমাণ কিছু কমে গেল।এ সম্বন্ধে 'আইন'-"Akbar in his wisdom seeing that the variety of measures was a source of inconvenience to his subjects, and regarding it as, subservient to only the dishonest, abolished them all and brought a medium gaz of 41 digits into general use."

**'খল ভুমি লিখে লাল'** –অর্থাত অনুর্বর জমিকে উর্বর ব'লে গণ্য করে ।এতে দৃশ্যতঃ রাজার লাভ, ঐ গুলিতে উর্বর জমির সমান রাজস্ব প্রাপ্তি। কিন্তু ভিন্ন কারণে ঐরূপ করতে হয়েছিল ব'লে মনে হয়।রাজ্যে যাতে সুবৃষ্টি হয়,ভাল ফসল হয় এবং কর্ষণযোগ্য সমস্ত ভূমিতেই ফসল ফলানো হয় এ বিষয়ে যে আকবরের সতত উৎকণ্ঠা ছিল তা 'আকবর-নামা' থেকে জানা যায়।অথচ তুচ্ছ কারণে কৃষকেরা আবাদ না ক'রে জমি ফেলে রাখত (এরূপ ব্যাপার সেদিনও আমরা দেখেছি)। এজন্য উজীর এবং রাজস্ব সমাহর্তাদের নিকট আকবরের নির্দশ ছিল- "No such land should be suffered to fall waste." কর্ষণযোগ্য অথচ পতিত রাখা হয়েছে এরূপ জমিতে কৃষক যাতে ফসল ফলায় সেজন্যই বোধ হয় এরূপ উদ্যম।'সরকার' বলতে বুঝায় জমি-জমার আয়ত্ন,পড়চা নম্বর প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মচারী।

**'বিনা উপকারে খায় ধুতি'**-ডিহিদার,সরকার,প্রভৃতি কর্মচারীরা আঞ্চলিক লোক ছিল ব'লে তাদের ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করার রীতি ছিল।এক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করেও 'সরকার' যে উপকার করতে পারেন নি এতে উপর ওয়ালাদের জাগ্রত তীক্ষদৃষ্টির বিষয় জানায়।

**'পোতদার হইল যম,টাকা আড়াই আনা কম'** ইত্যাদি-পোতদার=ফোতদার। ধাতব মান বিষয়ে অভিজ্ঞ খাজনাখানার কর্মচারী। পুরাতন থেকে নোতুন মুদ্রার ধাতব মানাধিক্যই পুরাতনের মূল্য কম হওয়ার কারণ।নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব কৃষক প্রজাকে খাজনাখানায় টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।সময় অতীত হলে যাঁরা মুদ্রা বিনিময়ের জন্য আসবেন তাঁদের উপর 'দিন প্রতি' এক পাই করে জরিমানাও ধার্য করা হয়েছিল।পূর্বেকার আফগান সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন আকৃতির ও মানের মুদ্রা অনেকের কাছেই ছিল। তাঁদের টাকা প্রতি কিছু করে ক্ষতি স্বীকার

করতে হয়েছিল কারণ,ভিন্ন রাজত্বের মুদ্রাগুলি তাদের নিহিত ধাতব মূল্যেই গৃহীত হওয়ার নির্দেশ ছিল। এ সম্পর্কে সমাহর্তার নিকট এবং পোতদারের নিকট নিম্নলিখিতরূপ নির্দশ দেওয়া ছিল-

(১)"Let him (the Collector) see that the treasurer does not demand any special kind of coin, but take what is standard weight and proof and receive the equivalent of the deficiency at the value of current coin and accord the difference in the voucher."
(2)"He (the treasurer)should receive from the cultivators any kind of mohurs,rupees or coppers that he may bring and not demand any particular coin.He shall require no rebate on the august coinage of the realm, but take merely the equivalent of the defficiency in coin-weight. Coinage of former reigns he shall accept as bullions."

অতএব, টাকায় আড়াই আনা এবং দিন প্রতি পাই লভ্য পোতদারের প্রাপ্য ছিল না। এ ফোতদারি করও নয়।কারণ ফোতদারি, দারোগোনা প্রভৃতি যেসব আবোয়াব পূর্বে প্রচলিত ছিল, আকবর তা নিষিদ্ধ করেন ('আইন')।অরাজকতার কল্পনা করলেও একজন পোতদার এইভাবে নিয়ম ক'রে প্রভূত রোজগার করতে থাকবে এ অসম্ভব।

**'ডিহিদার অবুঝ খোজ, কড়ি দিলে নহে রোজ'**- মকদ্দম বা ডিহিদার গ্রামবাসীদের নিকটে প্রত্যক্ষ দেবতা, সদাজাগ্রত। তাকে প্রসন্ন না রাখলে সমূহ বিপদে পড়তে হ'ত।কিন্তু মামুদ শরীফ্‌কে উৎকোচের দ্বারা প্রসন্ন করা দুরূহ ছিল। এর কারণ অবশ্য তার ব্যক্তিগত উন্নত চারিত্র্য না হতেও পারে।মানসিংহের তত্তাবধানে নোতুন সংগঠনের কাজকে যুদ্ধকালীন কর্তব্যের ন্যায় গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকবে। কর্মচারী-ব্যূহের এই অভিযানে কারও অসংগত কিছু করার অবকাশ ছিল না।সেইজন্য না সরকার,না ডিহিদার, কেউই প্রজাগণের অভিলষিত উপকারে আসে নি।

**'পেয়াদা সবার কাছে,প্রজারা পালায় পাছে'**-বিশৃঙ্খলার সময় এরকম কখনো ঘটতে পারত না।এতে কোনও একটা নিয়মপদ্ধতির অনুসরণই লক্ষ্য করা যায়।প্রজারা পালালে ফসল,রাজস্ব প্রভৃতির অসুবিধায় রাষ্ট্রের ক্ষতি। কোনও প্রজা পালালে মকদ্দম বা দিহিদারকে জবাবদিহি করতে হত।সেজন্য ডিহিদার পেয়াদার সাহায্যে প্রজাদের পলায়ন নিবারণের ব্যবস্থা করেছিলেন।কিন্তু রাজকর্মচারীদের এই নোতুন উদ্যমে প্রজারা যেমন সন্ত্রস্ত হয়েছিল তাতে তাদের দিক থেকে

পলায়ন ছাড়া পথও ছিল না।

**‘প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হিলা বন্দী’**-নিশ্চয়ই জমি-জমা বা রাজস্ব নিয়ে গুরুতর কোনও স্থলনের জন্য তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে থাকবেন।কবি বলছেন, ‘হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে’ – অর্থাৎ এমন জট পাকিয়েছিলেন যে উদ্ধায়ের উপায় ছিল না।এঁর অধীনস্থ চাষী হিসাবে মুকুন্দকবিও নিজেকে আশ্রয়হীন ভেবে গ্রামত্যাগে উদ্‌যোগী হয়েছিলেন।

এইভাবে কবি মুকুন্দের গ্রামত্যাগ ও গ্রন্থরচনার উপক্রম অংশটি ইতিহারসের সঙ্গে মিলিয়ে এবং ইতিহাসকে আত্মপরিচয়ের বর্ণনা দ্বারা পরিস্ফুটভাবে অনুধাবন ক’রে আমরা দেখলাম যে-

(ক)মুকুন্দকবি বিদেশী শাসকের অত্যাচারে বিতাড়িত হন নি। কিন্তু কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট সামগ্রিক পরিবর্তনমূলক শাসনব্যবস্থায় প্রাথমিক নানা অসুবিধা অনুভূত হওয়ায় গোপনে পলায়ন করেছিলেন।তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিগ্রহ ভোগ করেন নি। ‘আসল তুমার জমা’ বাঙলায় কার্যকর হয়নি।

(খ)তিনি যে আরড়া গ্রামে গেলেন তার কারণ,এটিই সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান যেখানে পুরাতন মুদ্রামান বজায় ছিল এবং পুরাতন জমিদারী অধিকারের আশ্রয়ে সাময়িক নিশ্চিন্ততা বর্তমান ছিল।
(গ)তাঁকে দুর্বিপাক ভোগ করতে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা বেশিদিনের নয়। পথযাত্রার কষ্ট ১০/১২ দিনের হতে পারে।

(ঘ)তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৫৯৬ খ্রীঃ-এর পূর্বে কখনোই নয়।তাঁর প্রদত্ত বিবরণ থেকে অনুমান হয় ১৬০০ খ্রীঃ গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। গ্রন্থ শেষ করতে পাঁচ-সাত বৎসরের কম সময় লাগেনি।

# কবিকঙ্কণের কাব্যের পাঠভেদ ও চিন্তা

শ্রীকবিকঙ্কণ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের নিতান্ত কাছাকাছি সময়ে তাঁর অম্বিকামঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। ধনপতির উপাখ্যান বা বণিক্‌খণ্ড পর্যন্ত লিখতে তাঁর অন্তত ১০/১২ বছর লাগার কথা। ফলত দেখা যায়, একই সময়ে, ভারতবর্ষের দুই প্রান্তে বাংলাভাষার দু'খানি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখিত হয়েছে – চণ্ডীমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত।

মুকুন্দের কাব্য যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর কারণ নিঃসন্দেহে সমাজবোধের সঙ্গে তাঁর রচনাগুণও। পরিমিত কথায় বিশেষ বিশেষ ঘটনা-মুহূর্ত ও চরিত্রগুলিকে তিনি শ্রোতৃবর্গের কাছে প্রত্যক্ষবৎ ক'রে তুলেছিলেন, এই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আর, বর্ণনার মধ্যে প্রাপ্ত অবকাশগুলিকে উত্তম কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে করতে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তার পরিশেষে তাঁর নিজ রচনাকে প্রক্ষেপ-সমাচ্ছন্ন করতে সাহায্য করেছে। কীভাবে, তাঁর আলোচনাই আজকের নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

মধ্যযুগের অধিকাংশ কাব্যরচনাই সুরসহযোগে গেয় ছিল। কবিদের বিরচিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সরল ছন্দে নিবন্ধ কাব্যাংশগুলি দেশীয়, ধ্রুবপদ্ধতির অথবা বিমিশ্র সুর সহযোগে গান করতেন গায়কেরা। চণ্ডীমঙ্গলের দুতি আখ্যানে ষোলোটি পালা, দিবা ও নিশায় বিভক্ত হয়ে এক মঙ্গলবারে প্রারব্ধ হয়ে অন্য মঙ্গলবারে শেষ হ'ত। মুকুন্দকবি বলেছেন 'লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ, নহি সঙ্গীতের পন্থ' এবং 'অনভিজ্ঞ তালমানে, কেমনে বুঝাব আনে'। আশ্রয়দাতা জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের গায়েন নিয়োগ করে। তাঁর কাব্যের খ্যাতি যতই ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে থাকে, গায়েনের সংখ্যা ততই অধিক হতে থাকে এবং এইভাবে তিনশ' বছর ধ'রে বংশানুক্রমে অগণিত গায়ক সারা বাঙলায়, বিশেষভাবে মধ্য ও দক্ষিণ বাঙলায় গান ক'রে এসেছেন। ফলে অগণিত পুঁথি অনুলিখিত হয়েছে এবং গায়কদের মুখে মুখে কবির মূল রচনা নানাভাবে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। পুঁথি লেখকেরা কপি করতে গিয়ে যদিচ

বর্ণে এবং শব্দে বিকৃতি ঘটিয়েছিলেন, পালা গায়েনেরা কখনও ভুল ক'রে অন্য বাক্য বসিয়েছেন, ফারসী শব্দ বুঝতে না পেরে যা-হোক একটা শব্দ লাগিয়েছিলেন, কোনো কোনো অংশ উল্টে পাল্টে গেয়েছেন, আবার স্থান-কাল প্রয়োজনে নতুন অংশও সংযোজন করেছেন বিস্তর। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ক্ষেত্রেই হয়ত এরকম পাঠবিকৃতি ও প্রক্ষেপের মাত্রা সর্বোচ্চ, কিন্তু মধ্যবাংলায় তার পরেই বোধয় মুকুন্দকাব্যের স্থান।

আমাদের সমস্যা হ'ল এরকম পাঠবিকৃতি, প্রক্ষেপ, ওলট-পালট প্রভৃতির মধ্য থেকে কবির মূল পাঠ উদ্ধার করা যায় কী প্রকারে। এবিষয়ে সাধারণ নীতি হবে একাধিক পুরাতন পুঁথির পাঠ মিলিয়ে যুক্তি বিচার সহকারে একটি আদর্শ পাঠ ঠিক করা এবং পাঠকদের বিচারবোধ পরিতৃপ্ত করতে একেবারে অসম্ভব পাঠ বর্জন করে অবান্তর পাঠগুলি ঐ সঙ্গে গ্রথিত করা। কিন্তু এ যাবৎ চণ্ডীমঙ্গলের যে ক'টি পুঁথি মুদ্রিত হয়েছে তা মুখ্যত এক একটি পুঁথির উপরেই ভিত্তি ক'রে। সম্পাদক মহাশয় যে পুঁথিটি সমাহরণ করেছেন তাকেই সর্বাগ্রগন্য মনে ক'রে উচ্চ প্রশংসা ক'রে ছাপিয়েছেন। কেউ আবার ' যদ্দৃষ্টং তচ্ছাপিতং সম্পাদকে দোষো নাস্তি' ব'লে গায়েনের এবং লিপিকরের প্রকট প্রমাদে পূর্ণ পুঁথি অবিকৃতই ছাপিয়েছেন। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলা যায়, স্বর্গত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দামিন্যার নিকটবর্তী স্থানে কবির বংশধরদের একজনের কাছ থেকে একটি পুঁথি পেয়ে তা নকল করিয়ে ছাপান এবং মনে করেন এইটিই আদর্শ পুঁথি। কিন্তু ঐ সঙ্গে বর্ধমান-মেদ্‌নীপুর অঞ্চলের অন্য দুএকটি পুরাতন পুঁথি যদি তাঁরা মিলিয়ে দেখতেন তাহ'লে নিশ্চয়ই বুঝতেন যে বহু চরণের অপেক্ষাকৃত যুক্তিসঙ্গত এবং সুবোধ্য পাঠ ঐ পুঁথিগুলিতেই মিলছে, ঠিক দামিন্যায় প্রাপ্ত ঐ পুঁন্থিতে নয়। দামিন্যা বা কইতি গ্রাম কবির জন্মভূমি ও নিকটবর্তী স্থান হলেও সেখানকার প্রাপ্ত পুঁথিতেই যে আদর্শ পাঠ রক্ষিত হয়েছে এমন মনে করা ভ্রমাত্মক। মুকুন্দকবি তো পুঁথি লিখেছিলেন ঘাটাল অঞ্চলের নিকটবর্তী আরড়ায়। তস্য অনুলিপি তস্য অনুলিপি হতে হতে এবং গায়েনের পর গায়েনেরা গান করতে করতে একশ' বছরের মধ্যেই নানান্ পাঠবিকৃতি প্রচলিত হতে আরম্ভ করেছে। মুকুন্দকবির পুত্র পৌত্রেরা যারা আরডা থেকে দামিন্যায় ফিরে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেছিলেন তাঁরা যে এখনকার বৈজ্ঞানিক ও সারস্বত বুদ্ধি নিয়ে কবির নিজরচনা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এমন অনুমানও সম্ভব নয়। তবু একথা বলা যায় যে শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবুর ঐ সংস্করণ তখনকার প্রচলিত ও কল্পিত বা নবীকৃত পাঠযুক্ত বঙ্গবাসী সংস্করণ থেকে ঢের বেশি মূলের কাছাকাছি।

চণ্ডীমঙ্গলের একটি পুঁথিকে আদর্শ ধ'রে অন্য দুটি পুঁথির পাঠ মিলিয়ে একটি আদর্শ সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ করা হয় ইং ১৯৫০-৫২ সালে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত

বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের সম্পাদনায়। এতে কালকেতুর কাহিনী পর্যন্ত প্রথম ভাগ মাত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ এটিই হ'ল প্রথম সেই উদ্‌যোগ যাতে একাধিক পুঁথির পাঠ মিলিয়ে, এবং পাঠান্তর সন্নিবেশ ক'রে সত্য সংরক্ষণের বিষয়ে অপেক্ষাকৃত আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও সমস্যার সমাধানের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব হয়নি। তার কারণ, ঐ সংস্করণে পুরাতন পুঁথি একখানিও অবলম্বিত হয়নি। তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত পুঁথির পরামর্শের প্রয়োজনীয়তাও ঐ সংস্করণে বিবেচিত হয়নি। অবশ্য অপেক্ষাকৃত পুরাতন পুঁথিতেই যে অপেক্ষাকৃত নবীন পুঁথির তুলনায় আদর্শ পাঠ পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। কারন, এমনও হতে পারে যে নবীন পুঁথিটি যার অনুলিপি, সে-পুঁথিতে হয়ত আদর্শ পাঠ বহুল-পরিমাণে রক্ষিতই ছিল। এরকম ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকখানি পুঁথির পাঠ তুলনামূলক ভাবে বিচার ক'রে যুক্তিসংগত আদর্শে পৌঁছানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিককার সম্ভাব্য ভাষারূপের দিকটিও লক্ষ্য করতে হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত কালকেতু- উপাখ্যান মোটামুটি গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হ'লেও এতে যে সব অসংগতির সম্মুখীন হওয়া গেছে তা তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি। বলা বাহুল্য, অন্যান্য নির্ভরযোগ্য পুঁথিদৃষ্টেই আমরা এই সব অসঙ্গতি ধরতে পারছি।

(ক) আখ্যান বর্ণনগত অসংগতি :

দেবতা-বন্দনার পারম্পর্য বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন প্রকার। মহাদেব-বর্ণনা বেশ কয়েকটি পুরাতন পুঁথিতেই নাই। শুকদেব-বন্দনা পর্যালোচিত দশটি পুঁথির মধ্যে কোনটিতেই দেখা গেল না। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণেও দেখি এটি মুদ্রিত বঙ্গবাসী সংস্করণ থেকে সমাহৃত। চণ্ডী-বন্দনা ('বিঘ্ন-বিনাশিনী' বা 'বন্দো পিণাকিনী' বা 'বিন্দু-বিলাসিনী') অংশটি অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য পুঁথিতেই দৈবকীনন্দনের ভনিতায় রয়েছে। এটি রচনাংশেও খুব দুর্বল।

মুকুন্দকবির আত্মপরিচয় বা গ্রন্থ উৎপত্তির কারন কোনো পুঁথিতে প্রারম্ভেই বর্ণিত, কোন পুঁথিতে দেবতা-বন্দনের পরে, কোনো কোনো পুঁথিতে আবার এই অংশ অবিদ্যমান। অনুমান হয়, বর্ণনটি মিথ্যা নয়, কিন্তু পালাগায়েনেরা কোথাও কোথাও এটি অবান্তর বোধে বর্জন করেছিলেন। আবার, দামিন্যা গ্রামের বর্ণনমূলক আত্মপরিচয়ের অপর একটি অংশ নির্ভরযোগ্য কোনো পুঁথিতেই পাওয়া যায়নি। এতে প্রদত্ত বংশ-পরিচয় কবির ভনিতায় প্রদত্ত আত্মবিবরণের কিছু বিরোধীও।

দেব-খন্ড অংশের সতীর দেহত্যাগে মাতা প্রসূতির বিলাপ (ত্রিপদী) কয়েকটি পুরাতন পুঁথিতেই রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ওটা পাঠান্তরে স্থানলাভ করেছে। তেমনি দক্ষযজ্ঞ-

বিনাশের পর ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের স্তব অংশটি ঐসব পুঁথিতে পাওয়া গেলেও কঃ বিঃ টে পাঠান্তরে গ্রহিত হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে আংশিক মিল আছে এমন অবস্থায় কেবল অমিল অংশটির গ্রহণ ঘটনার বিচারে যুক্তিযত কিনা তা দেখা  হয় নি। 'প্রসূতির খেদ' বিবরণমূলক ত্রিপদী অংশটি কাব্যাংশে মন্দ নয় এবং কয়েকটি পুরাতন ও প্রামাণিক পুঁথিতেই রয়েছে, এখানে এটি পাঠান্তরে সংযোজিত। দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গের পর বর্ণিত ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের স্তব বিষয়েও একই কথা বলা যায়। গণেশের জন্ম এবং গণেশের গজমুন্ড প্রাপ্তি বিষয়ে লৌকিক এবং পৌরাণিক দু'রকম উপাখ্যান দেখা যায়। মুকুন্দকবি এর মধ্যে লৌকিক আখ্যানটিকেই গ্রহণ ক'রে থাকবেন। তবু এই আখ্যানের বর্ণনায় কিছু কপি-ছাড় হয়ে গেছে ব'লে মনে হয়। উক্ত দেবতা-খন্ডে পার্বতীর আত্মপূজা-প্রচার সুচনাংশে "নীলাম্বরে শাপ দিয়ে যদি লহ ক্ষিতি" প্রভৃতি বর্ণনা একাধিক বার গ্রথিত হয়েছে। তা ছাড়া ঐ অংশের কয়েক স্থানেই প্রসঙ্গের যৌক্তিকতা নেই। ফলে বোঝা যায় অনুসৃত পুঁথির পাঠ সর্বাংশে ঠিক নয়।

ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে স্বগৃহে দেখার পর ফুল্লরা তাকে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয় ও এই প্রসঙ্গে রামায়ণের সীতাবর্জনের কাহিনীর উল্লেখ করে। এটি প্রাসঙ্গিক ও স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সঙ্গে ফুল্লরার 'পুর্নবার উপদেশ' এবং পৌরানিক কাহিনীর বিস্তৃত উলেখ স্বাভাবিক নয়। বস্তুতঃ এই অংশ পুরনো কয়েকটি পুঁথিতে নেইও। মূল বারমাস্যার বর্ণনার কথায় পরে আসছি। ঐ বারমাস্যা বর্ণনার অন্তে দেখছি 'আশ্বাস করিয়া তারে বলেন ভারতী' এবং ঠিক তারপরেই রয়েছে 'কান্দিতে কান্দিতে রামা গোলাহাট চলে'। এই পারম্পর্য যুক্তিহীন। বরংচ পূর্ববর্ণিত "হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ বীরবরে" প্রভৃতির পরই ফুল্লরার গোলাহাট গমন যৌক্তিক হয়। দু' টি পুরানো পুঁথিতে সেইরকমই দেখছি। এর পর রামায়ণের বিষয় উল্লেখ ক'রে ফুল্লরার কালকেতুকে  উপদেশদানও অর্থহীন। কারন, কালকেতু নিজেই ঐ সব উল্লেখ ক'রে চণ্ডীকে তার গৃহে অবস্থান থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে। এই সব স্থানে পুঁথিতে পুঁথিতে পাঠবিভ্রাটও কম নয়। সুতরাং যে পাঠ যুক্তিসংগত তা-ই গ্রহণীয়। চণ্ডীর নিজমুখে শতনাম কখন অংশটিও আমাদের আদর্শ ঐ পুরানো পুঁথিগুলিতে আমরা পাইনি। (কঃ বিঃ সংস্করণ ও সেই সঙ্গে লেখক সম্পাদিত "কবিকিঙ্কন চণ্ডী" দ্রঃ) কালকেতুর অনুরোধে দেবীর মহিশমর্দিনী রূপধারণ সর্বত্রই বর্ণিত।

### (খ) বর্ণন বিষয়ে ক্রমের বিপর্যয় :

পয়ারেই হোক আর ত্রিপদীতেই হোক, যেখানে ঠিক কাহিনীর সুত্র তেমন প্রকট নয় এমন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বন্দনা, রূপবর্ণনা, বৃক্ষলতা পশুপক্ষীর বর্ণনা অথবা যেখানে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত কোনো বক্তার একটানা বক্তব্য রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে শ্লোকগুলির স্থানবিপর্যয় ঘটেছে। গায়কদের

অসাবধানতার জন্যেই এমন ঘটেছে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে বর্ণনা-সংগতি রক্ষিত হয়, আর্থিক ক্রমের বিপর্যয় না ঘটে, তুলনামূলক বিচার ক'রে এমন পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছেঃ

আদিদেবীর বর্ণনা (পৃঃ ৩৬)। এর দশটি শ্লোকে প্রথমে সাধারণভাবে দেহজ্যোতি ও রূপবর্ণনা দিয়ে পরে পদ, নূপর, গতি, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, মুখমণ্ডলের প্রত্যঙ্গগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মুদ্রিত পুঁথিতে ক্রম ঠিক নেই। কবি নিশ্চয়ই পায়ের বর্ণনা দিয়েই মুখের এমন ওলটপালট করেননি। পুঁথিগুলিতেও এরকম বিভ্রাট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দক্ষের শিবনিন্দা অংশ (পৃঃ ৪৭)। এখানে শ্লোকের অর্ধাংশেরও স্থান-বিপর্যয় দেখছি। মুদ্রিত গ্রন্থে – 'নাহি জানি আদিমূল – আমি ছার মন্দমতি।' একটি পুঁথিতে 'নাহি জানি আদিমূল – ভূষণ হাড়ের মালা' আবার 'চাহিতে চাহিতে ভাল – আমি ছার মন্দ বুদ্ধি।' এ রকম অন্যান্য ক্ষেত্রেও। ফলে বর্ণনার অর্থসংতির দিকে সম্পাদকের দৃষ্টি না রাখলেই নয়। 'শংকরের ভিক্ষা' অংশ (পৃঃ ১১৩) "জগতের ঈশ্বর ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘর" এর পরেই শিবের বেশবাস বর্ণিত, অথচ এই অংশের পর "ফ্রিয়ে উজান ভাটি চৌদিকে কোচের বাটি" প্রভৃতির বিন্যাসই সংগতিপূর্ণ। পুরাতন পুঁথিতে তা-ই আছে। গৌরীকে শিব-প্রদত্ত রন্ধনের তালিকা নিয়ে পুঁথিতে পুঁথিতে খুবই বিভ্রাট ঘটেছে। এতে যেমন রন্ধনের বিভিন্ন "পদ" নিয়ে ওলটপালট করা হয়েছে, তেমনি গায়ন নিজের পছন্দমত দু'একটি অতিরিক্ত "পদ" প্রক্ষেপ করেছেন। প্রথমে তিক্ত তারপর শুক্তা, এ পর্যন্ত সব পুঁথিতেই ঠিক আছে। কোনো কোনো পুঁথিতে এবং মুদ্রিত পুস্তকেও শাক, ডাল, মাছ এবং ঘণ্টের পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি। যদিচ পায়েসের বিষয় সর্বত্র শেষেই রয়েছে। ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে একটি মৌলিক বিভ্রাট দেখছি। কয়েকটি প্রাচীনতর এবং ভালো পুঁথিতেই বারমাস্যার প্রারম্ভ দেওয়া হয়েছে আষাঢ় থেকে, বৈশাখ থেকে নয়। আগেকার জমিদারি-ব্যাবস্থায় জমিজমা বন্দোবস্তের হিসাব ধরা হ'ত আষাঢ় থেকে। সেই অনুসারেই আষাঢ় দিয়ে প্রারম্ভ কিনা কে জানে। খুল্লনার বারমাসের দুঃখকথার সঙ্গে ফুল্লরার দেওয়া বিবরণের মিশ্রন ঘটেছে প্রায় সর্বত্র। "জানু ভানু কৃশাণু শীতের পরিত্রান" অথবা 'তৈল তুলা তনূনপাৎ" প্রভৃতি সংস্কৃত বচন ফুল্লরার মুখে মুকুন্দকবি বসাবেন এ অসম্ভব। এ ছাড়া অগ্রহায়ণ-পৌষ ফাল্গুন-চৈত্র, শ্রাবণ-ভাদ্র প্রভৃতির বর্ণনার মধ্যেও ওলটপালটের কিছু কিছু পরিচয় দেখা যাচ্ছে।

### (গ) প্রক্ষেপ বা অতিরিক্ত গ্রন্থন :

পালাগায়কেরা মূল মুকুন্দকবির রচনায় বেশ কিছু নিজ রচনা যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন তার নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বেই দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কবির মূল রচনা যে তাঁরা বর্জন করেননি এমন নয়,তবে তার পরিচয় স্বল্প। পল্লবিত করার দিকেই

গায়েনদের আগ্রহ সমধিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত পুঁথিতে যে 'মহাদেব-বন্দনা' পাচ্ছি, আমাদের পর্যালোচিত দশটি পুঁথির মধ্যে সাতটিতে তা নেই। ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে অনুলিখিত মেদ্‌নীপুর অঞ্চলের পুঁথিতেও নেই। রচনাটি ভালো ক'রে লক্ষ্য করুন, দুর্বলতার ছাপ পাওয়া যাবে নানা স্থানেই, যা অন্যান্য বন্দনার ক্ষেত্রে নেই। বঙ্গবাসী সংস্করণে একেবারে পৃথক্ 'মহাদেব-বন্দনা' পাওয়া যাচ্ছে, যা আর কোথাও দেখা যায় না। চণ্ডী-বন্দনায় (পৃঃ কথা পূর্বেই বলেছি) এই "বিঘ্নবিনাশিনী" বা "বিন্দু-বিলাশিনী" প্রভৃতি রচনাটি বিষ্ণুপুর, পাত্র-সায়ের, এবং আরও দু'খানি পুঁথিতে দৈবকী নন্দনের ভণিতায় রয়েছে। সুবে উড়িষ্যার (মেদ্‌নীপুর অঞ্চল) ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে এর পুঁথিতে এটি নেই। বন্দনাটির রচনায় রয়েছে নানান্ অসংগতি। "তালমান গানে উরহ গায়নে" এরকম উক্তি স্পষ্টতই গায়কের প্রার্থনা। অনুরূপ ভাবে সরস্বতী বন্দনার "হাতে লৈয়া পত্রমসী/ আপনি কলমে বসি/ যে বা লিখ যে বোল বানান/ নাহি জানি কৌতুকে/ অম্বিকা মুকুন্দমুখে/ আপন সংগীত রস গান" এই অংশটি সম্পর্কেও আমরা সন্দিগ্ধ। যে কটি পুঁথিতে এটি আছে, সে ক'টিতে পাঠভেদ বিচিত্র। তা ছাড়া এটি কবির কবিত্বলাভ অংশে বর্ণিত "হাথে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি"-প্রভৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র। "শুকদেব-বন্দনা" একমাত্র বঙ্গবাসী সংস্করণ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। দিগ্-বন্দনা বা আট দিকের বিভিন্ন মন্দির ও দেবতার বন্দনা অংশ যে কবির স্বকীয় রচনা সে বিষয়ে আমাদের প্রথমে সংশয় ছিল, পরে সংশয়ের কারণ নেই দেখছি। কিন্তু এর মধ্যে গায়কদের প্রক্ষেপও যথেষ্ট। মূল রচনার কিছু কাটছাঁটও করা হয়েছে যেন। শেষাংশে যেখানে গায়েনের আসরের এবং নায়েকের (যিনি পূজা, গাজন ও গান করান)পুনঃপুন উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এমন কথাও রয়েছে যে "দণ্ডবত হইয়া বন্দি শ্রীকবিকিঙ্কণ" তা যে মুকুন্দকবির রচনা হতে পারে এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। কয়েকটি পুঁথি তুলনামূলকভাবে আলচনা করলে দেখা যায় নারীদের পতিনিন্দা বর্ণনার অংশে কবি প্রত্যেক ক্ষেত্রে চার-চারটি চরণ ব্যাবহার করে গোদা পতি, দন্তহীন পতি, কালা পতি প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। চার পঙ্‌ক্তির অতিরিক্ত বর্ণনা, যেমন অন্ধপতির ক্ষেত্রে "অন্ধমুনির মত মোর গেল সর্বকাল/ জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল" – এরূপ বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। তেমনি -"আর সখী বলে মোর বাঘুড়িয়া স্বামী" প্রভৃতি পঙক্তির হীন রচনা কবিকিঙ্কণের হতে পারে না। আবার তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সংস্করণে "পোএর পো হইয়াছে নাতির হ্যাছে ঝি" প্রভৃতি এক বৃদ্ধার বর্ণনার কোনো পূর্বসূত্র নাই। অন্য পুঁথিতে দেখছি – " আয়্যর মিশালে বুড়ী নানা কাচ কাচে" প্রভৃতি সুত্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে এই সুত্র বাদ পড়েছে। এই পতিনিন্দার পরে ও হরগৌরীর বিবাহের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ২৩৭৫ (এটি বেশ প্রামাণিক পুঁথি) এবং ৪৯৬০ (এটিও মন্দ নয়) পুঁথিতে মহাদেবের শিশুরূপে উমার সঙ্গে মিলনের একটি বর্ণনা রয়েছে। বর্ণনা মন্দ নয়,তবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে স্থূল আদিরসের বিষয় রয়েছে। এটি আমরা বর্জন করারই পক্ষপাতী। কলিঙ্গে দেবীর পূজা বর্ণনার

একাংশে ভণিতার পর পূর্বাপর সংযোগহীন 'পূজার দক্ষিণা দিল হেমতোলা' প্রভৃতি চার চরণের ব্রাহ্মণমহিমা কীর্তন দ্যোতক অংশ আমরা প্রামাণিক পুঁথিগুলিতে পাচ্ছি না। এর পরে "পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন/ কেশরী শার্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ" প্রভৃতি পশুগণকে বরদান বর্ণনাই স্বাভাবিক ও সংগত প্রারম্ভ ব'লে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি – নীলাম্বরকে শাপ দেওয়ার বর্ণনায় – "যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কুমার" প্রভৃতি পঙক্তিগুলি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ১৩৭ পৃষ্ঠা এবং ১৪৯ পৃষ্ঠা দু'জায়গাতেই দেওয়া হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় স্থানে ঐ বর্ণনা পুনরায় না দিলে পরবর্তী অধ্যায়ের যোগসম্পর্ক থাকে না। একটা গোলমাল কোথাও নিশ্চয়ই হয়েছে। আবার দেখুন, ১৮৯-৯১ পৃষ্ঠার সিংহের নিকটে পশুগণের নিবেদন ও সিংহের নিকটে বাঘিনীর আবেদন প্রভৃতি অংশের বক্তব্য ও ভাষা কবি-বর্ণিত পশুগণের মানুষের মত আক্ষেপের বর্ণনার বিখ্যাত অংশের সঙ্গে প্রায় এক। এখানেও এমন সব পঙক্তি যৌক্তিক মনে হয় না। সব মিলিয়ে দেখতে হবে পশুদের অভয়দান অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ী পাঠে (৪৪০০ বা (খ) পুঁথি থেকে) একটি দীর্ঘ "অতিরিক্ত" অংশ যোজনা করা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল না, কারণ, এতেও পশুদের বিখ্যাত আক্ষেপ অংশকেই বিস্তৃত করা হয়েছে। ২২১ পৃষ্ঠার 'ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ' অংশটির বর্ণনা ২৩৭৫, ৪৯৫০ প্রভৃতি পুঁথিতে উপেক্ষিত। আবার ঐ বর্ণনার মধ্যেকার "মহিষ চিক্ষুর জম্ভ শুভ নিশম্ভ" প্রভৃতি পরবর্তী গোধিকারূপে বন্দী দেবীর আক্ষেপের অংশে কোনো কোনো পুঁথিতে রয়েছে। একটা মেশামেশি নিশ্চয়ই হয়েছে।

(ঘ) শ্লোকান্তগর্ত পাঠভেদ :

এর সংখ্যা প্রচুর এবং তার কিছু সংগত কিছু নয়। যেমন শ্রীরাম-বন্দনা অংশে "আসি দেব পুরন্দরে" স্থানে "আদিদেব পুরন্দরে"। শ্রীচৈতন্য বন্দনা অংশে "সঙ্গে প্রভু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ-কন্দ" স্থানে "সঙ্গে শিষ্য নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ-স্কন্ধ"। শ্রীচৈতন্যের পারিষদ প্রসঙ্গে "রাম লক্ষ্মী গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর" প্রভৃতির "রাম" শ্রীবাস-ভ্রাতা শ্রীরাম হলেও "বামে লক্ষ্মী গদাধর"ই বোধ হয় সংগত, যদিও "বামে" কোথাও পাচ্ছিনা, আবার লক্ষ্মী স্থানে "লক্ষ্ণণ"ও রয়েছে। এ পাঠ হতে পারে না। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণের "রামকৃষ্ণ গদাধর" পাঠে একেবারে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চৈতন্যের পারিষদ করা হয়েছে। অবশ্য আদর্শ পুঁথির কাছাকাছি ব'লে যাকে মনে করছি, সেই ২৩৭৫-এ "সঙ্গে লক্ষ্মী গদাধর"। ঐ অংশে "গলে দোলে নামডোর" পাঠই ঠিক, "প্রেমডোর" নয়, কারণ, মহাপ্রভু নামের সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য একটি দড়ি গ্রন্থিবদ্ধ ক'রে কখনও কোমরে কখনও গলায় ধারণ করতেন। "প্রার্থনা" অংশে "লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ/না জানি সঙ্গীত পন্থ" রয়েছে। ঐ অংশে একটি শ্লোকে "বাসনা" শব্দের সঙ্গে "বাসনা" শব্দেরই মিল করা হয়েছে। ঐ শ্লোকের প্রথমার্ধটি ভুল পাঠ। আত্মবিবরণে "ডিহিদার মামুদ শরীফ" স্থানে পাঠান্তর

পাচ্ছি "খিলাত পাইল" অথবা "বিলাত পাইল"। এর মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় অর্থহীন এবং লিপিকর-প্রমাদ। "খিলাত পাইল" পাঠ অবশ্য ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের সুবে উড়িষ্যায় লিখিত পুঁথিতেও পাই। তা ছাড়া "পেয়াদা সবার পাছে" স্থানে ঐ পুঁথিতে এবং অন্যত্র পাই "জানদার সভার পাছে"। এই পাঠগুলিই আমরা গ্রহণ করেছি। বলা বাহুল্য – "রাজা হৈল মহম্মদ সরীপ" এমন পাঠ আমরা কোথাও দেখছি না। ঐ অংশেই "ধন্য রাজা মাণসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ" স্থানে "বিষ্ণু পদে লহে ভৃঙ্গ" "লল ভৃঙ্গ" "নব ভৃঙ্গ" পাঠ দেখা যায়। বস্তুতঃ "বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ" পাঠ নিতান্ত আধুনিক পুঁথির। "বিষ্ণুপদে নব ভৃঙ্গ"ই সমীচীন। এর অবান্তর কারণ ঐতিহাসিক। ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মানসিংহ ("রাজা" নামেই প্রসিদ্ধ) উড়িষ্যা জয় ক'রে জগন্নাথ ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন যাপন ক'রে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন, তাই তিনি প্রশাসকরূপী "নবভৃঙ্গ"। "নৈবেদ্যে শালুক পোড়া" এ কখনও হতে পারে? পোড়া জিনিস কেউ নৈবেদ্যে দেয়? ভিন্ন পাঠ হ'ল "গোড়া" এবং "নাড়া"। আমরা দ্বিতীয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ "শালুক নাড়া"ই গ্রহণ করতে চাই। গঙ্গার চারটি পৌরাণিক ধারার বর্ণনায় – "সিতা ভদ্রা বঙ্কু নাম" – এর মধ্যে "বঙ্কু" সন্দিগ্ধ। অন্য পাঠ পাই "রাঙ্গা" "বিন্দু" প্রভৃতি। বক্ষু (Oxus) হবে কি? দক্ষের শিবনিন্দায় শিবের বর্ণনার মধ্যে "যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত" পাঠে "রক্ষ" অর্থহীন। আদর্শ পুঁথিগুলিতে "দানা"। দক্ষযজ্ঞে পার্বতীর পিতৃগৃহে যাওয়ার প্রার্থনার প্রারম্ভেই "এমন বলিয়া ধরে শিবের চরন" ইত্যাদি সহসা চরণে-ধরার চিত্র সুসমঞ্জস নয়। আদর্শ পুঁথিগুলিতে এই অংশ নেইও।

"সুধন্য বাঁকুড়া রায়" "সুমঙ্গল সুত্র করে" "সুসভায়", ইত্যাদির "সু"গুলি অন্যত্র নেই। এগুলি আধুনিক পুঁথির। আধুনিকে মনে করা হয়েছে যে ছন্দঃপতন হচ্ছে বুঝি। এরকম এক অক্ষর বাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষেত্র আধুনিক পুঁথির অন্যত্রও নানা ভাবে দৃষ্ট হচ্ছে। সে সব ক্ষেত্রে যে, সে, ত, এরকম অক্ষর বসিয়ে নেওয়া হয়েছে। আসলে দেখা যায়, ছন্দ অক্ষরবৃত্ত হলেও ষোড়শ-সপ্তাদশ শতাব্দীর কবি তখকার এবং পূর্বেকার রীতি অনুযায়ী যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রে যৌগিক অক্ষরটিকে স্বচ্ছন্দে দুমাত্রারই গ্রহণ করেছেন। তখন অক্ষরের মাত্রামুল্য (অক্ষরবৃত্তে যৌগিক=১, মাত্রাবৃত্তে যৌগিক=২) নিশ্চিত হয়ে পড়েনি। আরও দেখা যায়, লইয়া, দেখিয়া, করিয়াছি, প্রভৃতি শব্দের "ইয়া" প্রয়োজনমত দুমাত্রার অথবা এক মাত্রার গ্রহণ করেছেন কবি। তখনকার অক্ষরের মাত্রামুল্য এইসব ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপক ছিল বলেই এরকম ঘটেছে। এখনও দু'চারটি ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতার প্রভাব দেখা যায়, যদিচ অবকাশ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হয়ে এসেছে।

ঐখানে গৌরীর ক্রোধের অংশে "সক্রোধে হইয়া বামা" স্থানে আদর্শ পুঁথিগুলিতে সর্বত্র "সভারে হইয়া বামা" পাঠ পাই। এটিই ঠিক, কারণ, পূর্বেই "কোপবতী" শব্দ ব্যাবহার করা

হয়েছে। কবিকিঙ্কণের মত কবি একই কথা ঘন ঘন বলবেন এমন হতে পারে না। তপস্যা করেন গৌরী শিব পদ আশে/ আহার টুটিল গৌরীর দিবসে" এরকম স্থানে "আহার টুট্যাল মাতা" এই কর্তৃবাচ্যের ব্যাবহারই যথাযত এবং পুরানো পুঁথিগুলিতেও তাই। নৃসিংহ-রূপের বর্ণনায় – "লিখিল নৃসিংহ তনু অভিনব চন্দ্র ভানু" এস্থলে "লিখে নরসিংহ তনু অভিন্ন চন্দ্র ভানু" এরকম উন্নত পাঠই অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে। ফুল্লরার বারমাস্যা অংশে "ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন" স্থলে পাঠান্তর হ'ল "নয়নে নয়ন" এবং "অধর নয়ন"। তৃতীয় পাঠটিও যদিচ মন্দ নয় তবু আমাদের দ্বিতীয় পাঠটিই নিতে হবে, কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠতা। "অধর নয়ন" মেলি না বললে ফুল্লরার সংকোচের কারণ থাকতে পারে না, কারণ সে অন্য নারীর কাছেই বলছে। তবে 'নয়নে নয়ন'ই বাঙলার ইডিয়ম। একটি শব্দের পাঠ নিয়ে পুঁথিতে পুঁথিতে মতান্তর। "গঙ্গা বড় আঞ্জিয়ালী সদাই পাড়য়ে গালি" এই অংশের "আঞ্জিয়ালী" স্থান "আইঞ্জলী" "মায়াজালী" প্রভৃতি। সবই অর্থহীন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের এই পুঁথিতে পেলাম "অঙ্গজ্বালী" অর্থাৎ "গা-জ্বালানী" এবং এইটিই অপেক্ষাকৃত সমীচীন পাঠ ব'লে মনে করা হয়েছে। কালকেতুর সঙ্গে কলিঙ্গরাজের দ্বিতীয় যুদ্ধের বর্ণনায় প্রচলিত পাঠ হল "বীর লুকাইল ধান্যঘরে"। এতদিন আমরা এর অসমীচীনতা টের পাইনি। পেলাম, যখন দেখলাম আদর্শ পুঁথিগুলিতে রয়েছে 'ধনঘরে'। অন্তঃপুরের কাছে ধান্যগৃহ থাকতে পারে না। বারমাস্যা অংশে "ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা" এরকম পরস্পর-বিরোধী বাক্য কবির হতে পারে? আসল পাঠ হবে – "ফাল্গুনে বিগুণ শীত..." এইভাবে সন্দেহ সংশয় স্থলে পাঠের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সমীচীনতা অর্থাৎ অর্থসংগতি প্রভৃতি বিচার ক'রে তবেই ঠিক পাঠ নির্ধারণ করতে হবে আর একটি মাত্র পুঁথিকে আদর্শ ধ'রে প্রধানভাবে তারই উপর নির্ভর করা অনুচিত হবে এবং তা হয়েছেও।

(ঙ) ভাষা :

আধুনিক পুঁথিগুলিতে আধুনিক ভাষার পরিচয় মিলছে, ষোড়শ শতাব্দীর নয়। যেমন-কেনে, বেচে, শোনা, দিনু, কৈনু, যেমন, তেমন, হবে প্রভৃতি। ঠিক পাঠ হবে – কিনে, বিচে, যেমত, তেমত বা তেনমত, শুনে, আমি কৈনু স্থলে আমি কৈল, হবে স্থলে হইব প্রভৃতি।

খুবই সংক্ষেপে আলোচনা সমাপ্ত করা হ'ল। পরিশেষে একটি বক্তব্য প্রকাশ না করলেই নয়। কিছুকাল আগে ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত এবং সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত কবিকিঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল মুদ্রিত হয়েছে। আর দেখছি ডঃ সেন যে পুঁথিটির উপর প্রধানতঃ নির্ভর ক'রে মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন (বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮৬ সংখ্যক পুঁথি) তা আমরা সন্দিগ্ধ বোধে পূর্বেই এক পাশে রেখে দিয়েছিলাম। পুঁথিটির পুষ্পিকার পাতায় যদ্যপি ১৭১৭-১৮ খ্রিষ্টাব্দের তারিখ

রয়েছে, মাঝের পাতাগুলির কাগজ এবং হস্তলিপি সবই আধুনিক এবং বিভিন্ন ব্যাক্তির হস্তাক্ষরও রয়েছে। আমাদের ধারণায় শেষ পাতাটি উক্ত পুঁথির অবলম্বিত মূল পুঁথিটির হতেও বা পারে। তবু পুঁথিটি সন্দিগ্ধ নিশ্চয়ই। কঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের অনুলিখিত পুঁথিও রয়েছে (যদিও তা খণ্ডিত), আবার ঐরকম পুরানো হস্তাক্ষরের অন্য পুঁথিও রয়েছে, যা পড়াই কষ্টকর। অথচ উক্ত ১০৮৬ সং পুঁথির হস্তাক্ষরে কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই। তা সত্ত্বেও আমরা ঐ পুঁথিটির পাঠও আমাদের অন্য ৯/১০ খানি পুঁথির সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিবেচনা করেছি।

# পলাতক কবির সন্ধানে

কবিকে পালাতে হয়েছিল মধ্যযুগে, আর তাঁর পশ্চাদ্‌ধাবন করতে হ'ল একালে, কিছু কম চারশ' বছর পরে। রাষ্ট্রের প্রশাসনের কাজকর্মে সবকালেই যেমন কিছু অপদার্থ কর্মচারী থাকে তেমনি থাকে একশ্রেণীর ছোটমাপের কর্মচারী, ধ'রে আনতে বললে যারা বেঁধে আনে, যাদের অতিনিয়ম-নিষ্ঠা অতি-উৎসাহ সাধারণ মানুষের কাছে উৎপীড়ন হয়েই দেখা দেয়। ভারতের সম্রাট তখন আকবর, আর গৌড়-বাঙলার সুবাদার বহুশ্রুত রাজা–মানসিংহ। সোনায় সোহাগা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কৃষিসম্বল ও রাষ্ট্র প্রশাসন না-বোঝা সাধারণ মানুষের পক্ষে ঘটনাচক্রে বিপরীত ঘটল, যার ফলে জমিজমার দখল বিষয়ে সন্দিহান হয়ে আমাদের কবিকে সাতপুরুষের 'মিরাস' ছেড়ে পালাতে হ'ল, আশ্রয় নিতে হ'ল পুরানো প্রথায় চলিত ভিন্ন 'স্টেট'-এর এক সারস্বত মনোভাব-সম্পন্ন জমিদারের। বাধ্য হয়ে জমিজমা বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে আসা শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে শাপে বর হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তিনি স্থানীয় প্রশাসকদের, বিশেষত অত্যুৎসাহী গ্রামপ্রধানের অমানবিক কঠোর আচরণ ভুলতে পারেন নি,কাব্যের মধ্য তাঁকে কুখ্যাতির অমরত্ব দিয়ে গেছেন। আমাদের এই কবি হলেন অবিস্মরণীয় মুকুন্দ কবিকিঙ্কণ। মধ্য বাঙলায় কবিকিঙ্কণের পরও অন্য দু'জন কবিকে জমিজমা ও স্বগ্রাম ত্যাগ ক'রে অন্যত্র সরে যেতে দেখা যায়, কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে মুকুন্দকবির পলায়নের ব্যাপারই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য তাঁর পলায়নের পথ-পরিক্রমার পূর্বে একটু ইতিবৃত্তের ভুমিকা ক'রে নেওয়াই ভালো।

এই ঘটনার পূর্বে গৌড়ে চলছিল সুলেমান-দাউদ খাঁর স্বাধীন সুলতানি শাসন। ফলত জমিদার-তালুকরদারও স্বাধীন গ্রামীণ আধিপত্য। রাষ্ট্রগত লিখিত্‌পঠিত্‌ তেমন আইন কিছু ছিল না, পূর্বেকার সামন্ত-সংস্কার অনুসারে চলত গ্রামীণ প্রশাসন আর সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন সমাজ-পতিরা। তালুকদারেরা জমিদারকে রাজস্বে তুষ্ট ক'রে এবং জমিদারেরা সুলতানের দরবারে একটা হারে কিছু রাজস্ব দিয়ে ও প্রয়োজনে পাইক-ঘোড়সওয়ার এবং প্রচুর নজরানা পাঠিয়ে স্বাধিকারের অতিরিক্ত জমিজমা ও তস্য খাজনা নির্বিবাদে ভোগ করতেন। এটাই ছিল বহুকাল-

আগত রীতি। মাঝখানে শের শাহ জমিদাদের নিয়ন্ত্রণে আনার একটা প্রয়াস করলেও কৃষক প্রজাদের সামান্য সুরাহা ছাড়া তেমন কিছুই হয় নি। গৌড়-পশ্চিমবাঙলায় আকবরের অধিকার ঘটলেও দশ-পনেরো বছর নতুন প্রশাসনের পত্তন করা যায় নি, বিশৃঙ্খলা চলছিল। পূর্বেকার রীতিতে অভ্যস্ত পাঠান ও হিন্দু জমিদারেরা বিদ্রোহ করেছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন, পূর্ববঙ্গ ও ওড়িশায় আশ্রয় নিচ্ছিলেন, এসব ইতিহাসের ছাত্রদের জানা। পশ্চিমবাঙলায় একমাত্র মল্লভূমরাজ এবং কতিপয় ছোট জমিদার অবশ্য নির্দ্বিধায় মোগল সুবাদারের অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। ঐ সময় দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুরের অধিকাংশই ওড়িষ্যার পাঠান সর্দারদের প্রশাসনের অধীনে ছিল। গৌড়ে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ওড়িশায় হয় নি, এজন্য আকবর বিহারের সুবাদার তথা বহু সংগ্রামের সেনানায়ক ও দক্ষ প্রশাসক রাজা-মানসিংহকে ওড়িষ্যা বিজয়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। মানসিংহকে গৌড়ে এবং ওড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের উপর দিয়ে ওড়িষ্যার অভ্যন্তরে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছিল, এজন্য পূর্ব থেকেই তিনি গৌড়ের মানুষের পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন। খ্রীঃ ১৫৯১-৯২ এ মানসিংহ ওড়িষ্যার মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ওড়িষ্যার হিন্দু জমিদারেরা তাঁদের দেবসেবা-মূলক ভূমিব্যাবস্থায় আঘাত পড়বে এই মর্মে আকবরের কাছে আবেদন করলে আকবর ওড়িষ্যা অঞ্চলকে মোগল প্রশাসনের পুরোপুরি অধিন হওয়া থেকে আপাতত রেহাই দেন। এদিকে আকবর মানসিংহকে দিল্লীতে ডাকিয়া তাঁকে গৌড়ের সুবাদারের দায়িত্ব সহ গৌড়ে পাঠানোর ব্যাবস্থা করতে থাকেন। তখনও বঙ্গ-এলাকায় পাঠান ও হিন্দু প্রশাসক ও জমিদারের স্বাধীন রাজত্ব।

কাবুল থেকে গৌড় পর্যন্ত এলাকা আকবরের অধীনে এলে তিনি তোডরমল্লকে সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারি নিযুক্ত ক'রে বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত সমগ্র রাজ্যে একই প্রকার প্রশাসন, ভূমি-ব্যাবস্থা, মাপ, ওজন, মুদ্রামানের পরিবর্তন ও একই ধরনের নয়া প্রশাসকমণ্ডলী পত্তনের ব্যাবস্থা করতে নির্দেশ দেন। গৌড় ছাড়া উত্তর ভারতের সর্বত্র ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দেই নোতুন পদ্ধতির প্রশাসন ও সংস্কারের ব্যাবস্থা চালু হয়ে যায়। গৌড়বঙ্গ আকবরের সীমান্ত দেশ হওয়ায় এ বিষয়ে আকবর উদ্বিগ্ন ছিলেন। পূর্বেকার পাঠান সর্দার ও জমিদারদের অসন্তোষ প্রশমিত করতে গিয়ে সংস্কারের কাজে বিলম্বও হয়ে পড়ছিল। ইতিমধ্যে নুতন রীতির রাজস্ব ও প্রশাসন পদ্ধতির আর্কিটেক্ট তোডরমল ১৫৮৯ খ্রীঃ মারা গেলেন। ওড়িষ্যা বিজয়ের পর মানসিংহকে কেন্দ্রে ডাকিয়ে বছর দুয়েক সেখানে রেখে গৌড়ে নোতুন প্রশাসন কিভাবে চালু করা যেতে পারে, নতুন প্রশাসকমণ্ডলীর কর্তব্য ও পারস্পরিক যোগাযোগ কি ধরনের হবে এসব বিষয়ে প্রভূত উপদেশ দিয়ে আকবর পূর্বেকার সুবাদার সৈয়াদ খাঁর জায়গায় মানসিংহকে সুবাদার ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীঃ ১৫ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ) বাঙলায় সুবাদার পদে যোগ দিলেন এবং তাঁর

বহুদিনের সঙ্গী বিখ্যাত উজীর পত্রদাসকে নতুন প্রশাসক ও সংস্কার বিষয়ে দায়িত্ব দিলেন। অফিসার নিয়োগের ও অন্য কার্যারম্ভের উদ্যোগপর্ব চলছে, এমন সময় মানসিংহ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গ বিজয়ের পালা খানিকটা শেষ ক'রে ফিরে এলেন ঈশা খাঁকে যুদ্ধে কয়েকবার হারিয়ে দিয়ে। বঙ্গ থেকে ফিরে ১৫৯৫ খ্রীঃ মানসিংহ পত্রদাসের সাহায্যে নোতুন প্রশাসক দল নিয়ে তোডরমলের 'আসল তুমার জমা নির্ধারিত ভূমি-সংস্কার, মুদ্রামান নির্ধারণ, ওজন, পরিমাপ প্রভৃতির সংস্কারের উদযোগ করতে লাগলেন। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ হ'ল। মানসিংহ নিজে আজ বর্ধমান, কা'ল সেলিমাবাদ, কয়েকদিন পর জাহানাবাদ এরকম বিভিন্ন শহরে ছাউনি ফেলে ঘুরতে লাগলেন সরেজমিনে সংস্কারের কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর উজীর ঐ খ্যাতনামা ও সর্বজনপরিচিত পত্রদাসকে আজমীঢ়ে বদলি হতে হ'ল আর জরুরী কাজের জন্য। রায় পত্রদাসের জায়গায় তাঁর পুত্র কিসুদাস (রায়জাদা) চীফ নিযুক্ত হলেন। নবীন উজীরের কড়া হুকুমে দেশময় সন্ত্রাসের সঞ্চার ঘটল, অবর কর্মচারীরাও আক্ষরিকভাবে আইন অনুসরণ ক'রে নোতুন ব্যাবস্থাপনায় লেগে পড়লেন বা আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হলেন।

কবিকিঙ্কণ মুকুন্দ তাঁর পলায়ন ও অন্যত্র আশ্রয়লাভের বিবরণের মধ্যে রাজা মানসিংহকে গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের অধিপতি বলে বর্ণনা করেছেন, পত্রদাসের পুত্রের চীফ সেক্রেটারি হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, আর সরকার, পোতদার (=স্বর্ণমান নির্ধারক) প্রভৃতি কর্মচারীর প্রতিকূল আইন প্রয়োগের নিন্দা ক'রে গ্রাম-প্রশাসক 'ডিহিদার' মামুদ শরীফকে "টাকা হাতে দিলে প্রসন্ন হয় না এমনি অবুঝ খোজা" বলে বর্ণনা করেছেন। তালুকদারের অধীনে বৎসরান্তে নির্দিষ্ট কড়ি বা ধান ফেলে দিয়ে নিরুদ্বেগে কাল কাটানো যে কৃষককুলের অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল তাঁরা এই নয়া প্রশাসনে খুবই বিব্রত বোধ করেছিলেন। সাম্রাজ্যের মুদ্রামান থেকে পুরানো পাঠান আমলের মুদ্রামান নিহিত মূল্যে হীনশ্রেনীর হওয়ার জন্য 'সানাউত' বাট্টা দিতে হ'ল। তার উপর নির্দেশ হল প্রজাদের ট্রেজারিতে গিয়ে খাজনার টাকা জমা দিতে হবে, বিলম্বে দিন প্রতি এক পাই করে কেটে নেওয়া হবে ইত্যাদি। এর উপর আর এক গুরুতর দুর্বিপাকের সম্মুখীন হলেন এই কৃষক-কবি। যে তালুকদারের অধীনে তিনি জমিজমা ভোগদখল করতেন, সম্ভবত দেয় রাজস্বের বেশি জমিজমা দখলে রাখার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হ'ল, যার ফলে কবিরও জমিতে অধিকার সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল। তালুকদারের যাই হোক, কৃষক-প্রজাদের জোতজমিতে অধিকার নষ্ট হবে না, এরকম আইন বোধহয় প্রচলিত করা হয়নি। অথচ প্রজারা যাতে ঘরবাড়ি ছেড়ে না পালায় সেজন্য কড়া ব্যাবস্থা এবং স্পেশাল পুলিশ (জানদার) নিযুক্ত করা হয়েছিল।

এ ছাড়া মনে হয় সময়ের অভাবে অথবা স্থানীয় অফিসারদের গাফিলতিতে গুরুতর

সামুহিক পরিবর্তনের বিষয়টিও পূর্বাহ্নে প্রজাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় নি। এরকম ক্ষেত্রে গ্রাম-প্রশাসক, যাঁর সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ, তিনি যদি ভালোমানুষ হতেন হয়ত বা আশা-ভরসা দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রজাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু কোনো উপায়েই মামুদ শরীফের মেজাজ শরীফ করা সম্ভব ছিল না। ফলে বাধ্য হয়েই কবিকে সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ও গ্রাম ছাড়তে হয়েছিল।

কবির বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি খুব ভয়ে ভয়ে পথ অতিক্রম করেছিলেন এবং পাকা সড়ক দিয়ে না গিয়ে দুর্গম পথ ধরেছিলেন যাতে ডিহিদারের চর না টের পায়। এই ভাবে সপরিবারে বহু কষ্ট সহ্য ক'রে ওড়িষ্যার সরকারের অন্তর্গত নব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণভূম বা আরড়ার ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রয় পান এবং "জিতদৈন্য স্থিরচিত্ত" হয়ে কাব্য লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর রচনায় প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণের সঙ্গে সামন্ত রাষ্ট্রের প্রশাসনের ছবি, হিন্দু, অভিজাত উচ্চবর্ণের পাশাপাশি যাবতীয় মধ্য ও নিম্নবর্ণের মানুষের জীবীকার পরিচয়, কৃষকজীবনের বিশেষ পরিচয়, মুসলিমদের ধার্মিকতা ও সমাজ জীবনের চিত্র প্রভৃতি গ্রথিত হয়েছে। তখনকার সমাজ-ইতিহাসের দিক দিয়ে এসব তথ্য মুল্যবান্ দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্ণিত সমাজ-পরিস্থিতি ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের, তবে, পূর্বকার পরেকার মিলিয়ে বেশ কিছু কালের বলেই ধরতে হবে।

১৫৯৫-এ নয়া প্রশাসন ব্যাবস্থা ও ভূমিব্যাবস্থার পত্তন হলে এবং ক্রমে তালুকদার গোপিনাথ নন্দী কারারুদ্ধ হলে পর কিছু দিন অপেক্ষা ক'রে উপায়ান্তর না দেখে কবি গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, এই হিসাবে ১৫৯৬ তাঁর পলায়নের কাল ধরতে হয়। মাসের বিবেচনায় আশ্বিন মাস। কারণ, কবি শালুক ফুলের উল্লেখ করেছেন, আর শ্রাবণভাদ্রে তিনি নিশ্চয়ই বের হন নি। আরড়া (ব্রাহ্মণভূম পরগণা) হল মেদ্‌নীপুরের ১৪/১৫ মাইল উত্তরে শাল জঙ্গল ও অন্যান্য গ্রাম দিয়ে ঘেরা একটি গ্রাম। জমিদারের আমলে নিশ্চয়ই বড় গ্রাম ছিল এবং তার চিহ্নও রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে নামেই আরড়া-বাজার, অথচ বাজারের কোনো চিহ্নই নেই। কবি প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে তিনি স্বগ্রাম দামিন্যা থেকে এলেন ভালিয়া। ভালিয়ার রূপ রায় পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকাকড়ি যা ছিল নিয়ে নিলে পর, নিকটবর্তী গ্রামের যদু কুণ্ডু তাঁকে রক্ষা করেন ও তিন দিনের মত আশ্রয় ও আহার্য দেন। সেখানে তিন দিন লুকিয়ে থেকে পাশের মুড়াই নদী ধ'রে নৌকায় উজান পথে 'অদৃষ্টে না জানি কি আছে' ভাবতে ভাবতে দ্বারকেশ্বর তীরে তেউটিয়া গ্রামে এসে হাজির হন। সেখানে দ্বারকেশ্বর পার হয়ে কিছুদূর হেঁটে পাতুলি গ্রামে এসে (বর্তমানের পাতুল-সারা গ্রাম) গঙ্গাদাসের সাহায্য পান। সেখান থেকে পথে তাঁকে তিনটি নদী অতিক্রম করতে হয় – আমোদর,

নারায়ণ ও পরাশর। এগুলি অতিক্রম ক'রে গোচড্যা গ্রামে বিশ্রাম নেন। সেখানে একটি পুকুরের পাড়ে স্ত্রী শিশু সহ তাঁকে অনাহারে কাটাতে হয়। এইখানেই নাকি চণ্ডী মাতৃবেশে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করতে বলেন। এর পর কবি গোচড্যা থেকে দক্ষিণে শিলাই নদী অতিক্রম ক'রে চন্দ্রকোনা শহরকে পাশ কাটিয়ে শাল জঙ্গলের পথ ধ'রে আরড়ায় জমিদারের গৃহে উপনীত হন। কবি পরিষ্কারভাবে কিছু না বললেও অনুমান করা যায় এই রাজ-আশ্রয়ের ব্যাপারে, চণ্ডীবাটীর "শ্রীমন্ত খাঁ" সহায় হয়ে বাঁকুড়া রায়ের বা অন্য প্রভাবশালী কারও কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। যাই হোক, এখন কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাক।

দামিন্যার কয়েক মাইল উত্তরপূর্বে সেলিমাবাদ, সেকালের উক্ত 'সরকার'-বিভাগের হেড কোয়ার্টার। সেলিমাবাদ থেকে দক্ষিণে পশ্চিমে আট দশ মাইল দূরে কবির স্বগ্রাম দামিন্যা। সেলিমাবাদ সরকার ছিল পূর্ব-বর্ধমান, হুগলী এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে। বর্ধমান থেকে সেলিমাবাদ হয়ে দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর তীরে জাহানাবাদ (আরামবাগ) পর্যন্ত পাকা বাদশাহী সড়ক ছিল। জাহানাবাদ বা আরামবাগ থেকে দ্বারকেশ্বর  উত্তীর্ণ হয়ে পশ্চিম দিকে দুটি সড়ক ছিল, একটিতে পশ্চিমে খীরপাই মেদ্‌নীপুর হয়ে জলেশ্বর ভদ্‌রক কটক প্রভৃতি। এরই একটি শাখা হল পাতুল, মান্দারন, রামজীবনপুর, খীরপাই। অন্য পথটি জাহানাবাদ থেকে কোতোয়ালপুর (=কোতলপুর) বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া হয়ে কাশী পর্যন্ত, যে পথে এখন সরকারী বাস চলছে। কবি জাহানাবাদ দিয়েও যান নি, মান্দারন রামজীবনপুরের পথও ধরেন নি। পাতুল থেকে কামারপুকুর-এর দক্ষিণ দিয়ে যে হাঁটা পথ বেঁকে গুচুড়ে (=গো+চর+ডিহা) গ্রামের পাশ দিয়ে শ্রীনগর পর্যন্ত গেছে সেই পথ ধরেছিলেন। শ্রীনগর গ্রামে যান নি, শ্রীনগরের আগে গুচুড়ে (গোচড্যা) গ্রামেই আহার্য ও আশ্রয় খুঁজেছিলেন, পান নি। সেখান থেকে পুনরায় মেঠো মেঠো পথ ও অরন্যপথ ধরেছিলেন। এই পথনির্দেশই আমরা প্রামাণিক পুঁথিতে পেলাম আর পরিক্রমা ক'রে তা দেখেও নিলাম। পূর্বেই রেনেল-কৃত মানচিত্রের সঙ্গে কবি-বর্ণিত গ্রাম ও নদীগুলি মিলিয়ে নিয়েছিলাম।

কবির স্বগ্রাম দামিন্যায় অনেকেই গেছেন, বিবরণও দিয়েছেন, কিন্তু যেখানে কবি কাব্যটা লিখলেন এবং জীবনের শেষার্ধ কাটালেন সেই আরড়গড়ে কেউই যান নি। তা ছাড়া পুঁথির পথনির্দেশের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি মিলিয়ে নিয়ে পালাগায়েনদের প্রদত্ত যা-খুশী পাঠের ভুলের খণ্ডন তো করেনই নাই বরং ভুলকেই মেনে নিয়েছেন। আর এই ভুল নিয়েই আমাদের বৃহদায়তন সাহিত্যের ইতিহাসের বইগুলি ছাত্রদের সামনে বিরাজ করছে। একটা দৃষ্টান্ত ধরুন, দামিন্যা থেকে দক্ষিণপশ্চিম কবি যাচ্ছেন, দামোদর পড়ে থাকছে পুবে। কাজেই তাঁর দামোদর পার হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, এটা অসম্ভব কথা, অথচ সাহিত্যের ইতিহাসের বইয়ে তাই-ই দেখবেন।

এর কারণ, পালাগায়কেরা ও পুঁথিলেখকেরা 'আমোদর'কে দামোদর করেছেন। আর সাহিত্যের ইতিবৃত্তের লেখকেরা মানচিত্র খুলেও দেখেন নি।

আমরা দামিন্যা যাই নি। তার প্রয়োজনও ছিল না। ভালিয়া দামিন্যার ৬/৭ মাইল দক্ষিনের পাশের গ্রাম, বর্তমানে লোকে বলে তেলো-ভেলো। তেলিয়া গ্রামে তেলী-বৃত্তি ও জাতির নাম ধ'রে। 'যদু কুন্ডু তেলী কৈল রক্ষা'। গ্রামে এখনও কুণ্ডুদের বাস রয়েছে। তেলো-ভেলোর দক্ষিণ গা ঘেঁষে পুরানো মুড়াই নদী এখনো রয়েছে। মজা নদী, খাত ধরে দেখা গেল মানচিত্রে যেমন বর্ণনা আছে সেইমত উত্তর-পশ্চিম থেকে এঁকে বেঁকে দক্ষিণ-পূর্বে দামোদরের সঙ্গে এটি মিলেছিল। সম্ভবত তখন এটি ছিল উত্তরের দামোদর থেকে দক্ষিনের দামোদরের যোগকারক শাখানদী। এরই তীরে দ্বারকেশ্বরের কাছাকাছি তেউটিয়া, বর্তমানে তেউটে, আরামবাগের দশ মাইল উত্তরে। চর পুলিশের দৃষ্টির অলক্ষ্যে ঐখান দিয়ে দ্বারকেশ্বর পার হয়ে কবি সম্ভবত সন্ধ্যামুখে পাতুল পৌঁছে সেখানে গঙ্গাদাসের আতিথ্য ও সাহায্য পেয়েছিলেন। তেলো-ভেলোর ও মুড়াইয়ের দক্ষিণে পুরানো খোয়া-বাঁধানো ও মাঝামাঝি প্রস্থের একটি পথের চিহ্ন দেখা গেল। ঐ অঞ্চলের এক ব্যাক্তি বললেন এইটিই আগেকার বাদশাহী সড়ক। দক্ষিণে-বিস্তৃত মাইলব্যাপী যে ফাঁকা মাঠ মজা নদীর ধার ঘেঁষে প্রসারিত তার নাম ডাকাতে মাঠ। ঐখানেই শিশুকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী সারদাদেবী অপহৃত হয়েছিলেন ব'লে কথিত। গ্রামের লোকেরা বললেন দিন-দুপুরে চুরি ডাকাতির জন্য আজও ঐ অঞ্চল কুখ্যাত। মাঠে আগেকার ঐ ডাকাতে কালীর আধুনিক-সংস্করণ মূর্তি ও মন্দির দেখা গেল।

ওখান থেকে সোজা দক্ষিণে তিন-চার মাইল দূরে মুথাডাঙ্গা গিয়ে বাস ধ'রে আরামবাগ পৌঁছে সেখান থেকে সোজা মাইল আষ্টেক উত্তরে পাতুল (কবিকথিত পাতুলিপুরী) দেখে নিয়ে বাঁ দিকে মান্দারনের পথ ছেড়ে উত্তরে আরও দশ মাইল দূরে কামারপুকুরে গিয়ে পৌঁছানো গেল। ওখানে লোকজনের কাছে জেনে নেওয়া গেল যে আমাদর-খাল খুবই নিকটে এবং ঐরকম আরও দু-একটি খাল পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গুচুড়ে (গোচড্যা)। মেটে রাস্তা, হয়ত এতদিনে পাকা সড়ক হয়েছে। কবিকিঙ্কণের সময় হয়ত বা গোরুর গাড়ি চলার উপযোগী পথ ছিল, তাও বর্ষায় আগাগোড়া দুর্গম। রেনেলের মানচিত্রে আমোদর নদীর নাম দেওয়া রয়েছে আর নারায়ণ পরাশরের শুধু চিহ্ন দেখানো হয়েছে। ঐ তিনটি নদী চারশ বছর আগে বেশ বড় ছিল, ছিল দ্বারকেশ্বর বাঁ রূপনারায়ণের ও শিলাইয়ের উপনদী। বর্তমানে খাল ও জোড়ের আকৃতি, শীতগ্রীষ্মে হয়ে ওঠে শুকনো, বর্ষায় ভরাস্রোত। নারায়ণ ও পরাশরের বর্তমান নাম পাণ্ডুগ্রামের খাল ও তারাজুলি। তারাজুলি ছোট নদী হলেও বেশ গভীর এবং গ্রীষ্মেও কিছু জল রয়েছে দেখা

গেল। খাতে চর ও বেনা গাছের ঝোপ। বেশ বোঝা যায় বর্ষায় এসব অঞ্চল ডুবে যায়। আমাদের গাড়ি আর গেল না, তারাজুলি পার হয়ে বাঁ দিকে শ্রীনগর গ্রামে যাওয়ার ভালো রাস্তা, ডান দিকে আধমাইলের মত মাঠ পার হয়ে গুচুড়ে গ্রাম, নোতুন নাম বিষ্ণুদাসপুর রাখা হয়েছে। খড়ের চালার গৃহসমষ্টি ও সঙ্গে দু'একটি টিনের চালার কোঠাঘর রোদে চিকমিক করছে দেখা গেল; আর, স্পষ্ট দেখা গেল উত্তর প্রান্তে মাঝারি গোছের একটি দীঘি-পুকুর উঁচু পাড়। চার পাশে কিছু কিছু গাছ। অন্য কোনো পুকুর নজরে পড়ল না। তাহ'লে এই সেই পুকুর, যার জল খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করেছিলেন কবি ও কবিজায়া, আর শিশু মহেশ ভাত খাওয়ার জন্য বায়না ধরেছিল।

গুচুড়ে থেকে কোন পথ ধরে কবি হেঁটেছিলেন তা বোঝা গেল না। কয়েক মাইল দক্ষিনেই প্রসিদ্ধ চন্দ্রকোণা শহর, মাঝে শিলাই নদী। কবি শিলাই পার হওয়ার কথা লিখেছেন, কিন্তু চন্দ্রকোনায় যাওয়ার উল্লেখ করেন নি। মনে হয় আরামবাগ, মান্দারন প্রভৃতির মত চন্দ্রকোণাও পাশ কাটিয়ে গিয়ে শালের জঙ্গলের পথ ধরেছিলেন। চন্দ্রকোণা থেকে আট দশ মাইল দক্ষিনেই আরড়াগড়। ব্রাহ্মণভূম পরগণা চন্দ্রকোনা পরগণার সংলগ্ন। মনে হয় শিশুদের নিয়ে গুচুড়ে থেকে একদিনে আরড়া গড় তিনি যেতে পারেন নি। মাঝে কোথাও থেমে রাত্রিযাপন করেছিলেন, কিন্তু তার উল্লেখ নেই। আর উল্লেখ নেই আরড়া গড় পোঁছানোর আগে কুবাই নদীর। এমন হতে পারে যে বালুকাময় কুবাই পায়ে হেঁটেই পার হওয়া গিয়েছিল বলে তার নাম তিনি করেন নি।

আমরা বাসে চন্দ্রকোনা হয়ে শালবনী স্টেশন ও গ্রামে পৌঁছে সেখানে রাত্রিযাপন ক'রে পরের দিন কেউ রিকশায় কেউ বা সাইকেলে মাইল পাঁচ-ছয় মাঠের ও শালের জঙ্গলের পথ অতিক্রম ক'রে আরড়া গড়ে পৌঁছাই বেলা ন'টার সময়। আরড়া বা আরড়া-বাজার গ্রাম পার হয়ে দক্ষিণে কয়েকটি মাঠ পার হয়ে আরড়া গড়। দূর থেকে দেখা গেল লাল-কালো কাঁকরের লম্বা উঁচু পাড় ও ঢিবি। কাছে এসে দেখা গেল বিশাল চতুষ্কোণ পুষ্করিণীর চার পাশ ধ'রে ধসে-পড়া ঝামা পাথরের সমুচ্চ ঢিবিগুলি। আর তার চার  পাশেই গড়খাই। আজও তাতে জল রয়েছে। ঢিবিগুলিতে উঠে দেখা গেল বড়বড় চৌকোণা ঝামা পাথর আশে পাশে স্তূপের মধ্যে রয়েছে, কিছু গড়িয়ে পড়েছে পুকুরের মধ্যে। এই সব স্তূপের কোনো কোনোটি ছিল রাজার বসত বাটী। পাশে পাতলা ইঁট ও খোলামকুচি ছড়ানো দেখে মনে হল এখানে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর ছিল। এটি হ'ল পুষ্করিণীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণার অবস্থা, বেশ নিচে ঝোপ জঙ্গলে ঢাকা জলপূর্ণ গড়। দীঘির পূর্বদিকে রাজবাড়ীর সংলগ্ন পুরদ্বারের চিহ্ন খুবই স্পষ্ট। ঝামা এবং গ্রানিট পাথরে পুরদ্বার তৈরি করা হয়েছিল। এখানে কয়েক গজ অংশে গড় নেই, তার বদলে যাওয়া আসার পথের চিহ্ন রয়েছে। পুকুরের উত্তর পাড়ের পুব কোণায় আরও উঁচু ঢিবি। মনে হ'ল এখানে অফিস

কাছারি ও পাইক পেয়াদাদের থাকার জায়গা ছিল। সেখান থেকে দক্ষিণে দু-এক ফারলং দূরে অনুরূপ একটি দীঘি এবং তার চারপাশে অপেক্ষাকৃত কম উঁচু লাল কাঁকরের পাড় দেখা গেল। অনুমান হ'ল এটি রাজা রঘুনাথ রায়ের কোনো ভ্রাতার বা দুই পুত্রের (চক্রধর ও শ্রীধর) কোনো একজনের বাসভূমি হতে পারে। রাজবাটীর যে প্ল্যান দেখা গেল তাতে কবি-বর্ণিত গুজুরাট-গ্রামে কালকেতুর বাসভূমি নির্মাণের কথা মনে পড়ে গেল। নিঃসন্দেহে এই রাজবাটী থেকেই কবি কালকেতুর রাজবাটীর কল্পিত ছবি পেয়েছিলেন।

আরড়া-বাজার গ্রামে এসে দেখা গেল চারদিকে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি যা পূর্বে লোকের বসতবাটি ছিল। আর দেখা গেল ঝামা পাথর কেটে এবং উপরে ঝামাপাথর গেঁথে বাঁধানো পুরাতন চতুষ্কোণ কয়েকটি কূপ। দেখেই মনে পড়ল কবির বর্ণনা – প্রতি বাড়ী কূপের সঞ্চয়। বর্তমান আরড়াবাসী প্রায় সকলেই কৃষক, কিছু আগেও এখানে কুম্ভকার ও তন্তুবায়দের বাস ছিল একথা শোনা গেল। সব দেখে শুনে এবং ছোট ক্যামেরায় দু-চারটি ছবি তুলে বেলা এগারোটার পর চৈত্রের রৌদ্র মাথায় নিয়ে যাত্রা করা গেল রাজা রঘুনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনীর বা জয়চণ্ডীর মন্দির দেখতে। আরড়া থেকে মাইল খানেক দূরে অল্প শালের জঙ্গল পার হয়ে জয়পুর গ্রাম এবং গ্রামের উত্তরে শালের জঙ্গলের পাশে জয়চণ্ডীর মন্দির, প্রায় মজে আসা পুরনো পুষ্করিণী ও পাশে বিশাল বটগাছ। পাথরে তৈরী সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্তি, অসুর-দলনী, মন্দিরের পাঁচিলে গাঁথা পাথরের মূর্তি। মুখচ্ছবিতে তেমন উগ্রতা নেই। লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ নির্মাণের রেওয়াজ তখন ছিল না আর নিচে গোধিকা-বাহনও নজরে পড়ল না। মন্দির বহু আগেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। সত্তর বছর আগে এক মহিলা মন্দিরের নিম্নাংশ সংস্কার করিয়ে দেন, তার পরে আবার উপরের অর্ধাংশ ভেঙে গেছে। এখানেও সেই চৌকা ঝামা পাথর আর মাটিতে মন্দির প্রস্তুত হয়েছিল দেখা গেল। কিছু পাথর ও মাথার 'আমলক' মন্দিরের পিছনে পুকুরের উপর গড়িয়ে পড়েছে। এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে পুকুরে স্নান ক'রে মন্দিরে পূজো দিয়ে আমরা দুপুর রোদ মাথায় নিয়েই কেই সাইকেলে কেউ রিকশায় ফিরে এলাম শালবনীতে।

মধ্যেযুগের ইতিবৃত্ত লেখকেরা রাজমহিমা ও রাজকীর্তিই বর্ণনা করেছেন, লোকসংস্কৃতির দিকে তাকান নি। ইংরেজরা তাদেরই পদচিহ্নে এগিয়েছিলেন। ইদানীং সাহিত্য সংস্কৃতি সামাজিকতা নিয়ে লোক-ইতিহাস বা যথার্থ ইতিহাস নির্মাণের আগ্রহ জেগেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও সরেজমিনে সব বিষয় পরীক্ষা ক'রে দেখার প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভূত হচ্ছে না। গবেষকেরা গ্রাম এবং সাধারণ মানুষের দ্বারে ঘুরতে নারাজ। এরই মধ্যে আবার এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের লোক স্বমত স্থাপনের জন্যে প্রাচীন পুঁথিগুলির পাঠ পর্যন্ত বদলে নোতুন পাঠ যোজনা ক'রে বই

ছাপতে আরম্ভ করেছেন। এইসব বিকৃতি থেকে রক্ষা ক'রে দেশ ও মানুষকে তার যথাস্থিত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরপেক্ষ ও শ্রমশীল তরুণ গবেষকদের কাছে আবেদন জানাই।

ডঃ দাসের জন্ম বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে, বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আশ্বিন (খ্রীঃ ১৯১৬, ৯ অক্টোবর)। তিনি প্রয়াত হন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ২০০২ সালের ২৮ এপ্রিল। পিতা সতীশচন্দ্র, মাতা কামিনীবালা। গ্রামের মধ্য-ইং বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে বাঁকুড়া জিলা স্কুলে চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। ঐ সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের আদ্য, ও পুরাণ পরিষদের মধ্য পাস করেন। সেখান থেকে ১৯৩৩ খ্রীঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক'রে বাঁকুড়া মিশনারী কলেজে ইন্টার ও বি এ পড়েন। ১৯৩৭-এ সংস্কৃত অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরণের মধ্য পরীক্ষা পাস করেন। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্লা প'ড়ে ১৯৩৯ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বর্ণপদক সহ পাঁচটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি সংস্কৃতে কাব্যতীর্থ ও কাব্যরত্ন পরীক্ষায় পাস। অপরিসীম দারিদ্রোর সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এঁকে ছাত্রজীবন কাটাতে হয়।

এম-এ পাস করার পর বি-টি পাস ক'রে ইনি প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শকের কাজ নিয়ে কাল্না ও খানাকুলে বৎসর খানেক কাটিয়ে এবং ক'লকাতায় দু' একটি স্কুলে শিক্ষকতা ক'রে স্কটিশ চার্চ কলেজে দু' মাস, সিটি কমার্সে চার-পাঁচ মাস এবং উইমেন্স্ কলেজে তিন বৎসর মত অধ্যাপনা করেন। এরপর শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রথম -নমিনেশন পেয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দেন ১৯৪৫-এর জুলাইয়ে। প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে দশ বৎসর কাজ ক'রে (মাঝে দেড় মাস কোচবিহার কলেজ) ১৯৫৫ আগষ্ট মাসে প্রধান অধ্যাপক হিসাবে কৃষ্ণনগর কলেজে বদ্লি হন ।সেখান থেকে ১৯৫৯-১৯৭৩ পর্যন্ত মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ছ'মাসের জন্য হুগলী কলেজে কাজ করেন।তারপর ১৯৭৩ ১লা সেপ্টেম্বর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' পদে ।সেই পদে প্রায় সাড়ে সাত বৎসর কাজ করার পর অবসর নেন। অবসর নেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ তাঁকে তুলনামূলক অভিধান রচনার দায়িত্ব দেয়।কঠিন পরিশ্রম করে ও বয়সের বাধা অতিক্রম করে ১৯৯৬ সালে তিনি সেই অভিধান রচনা সমাপ্ত করেন।কেন সেই অভিধান আজও আলোর মুখ দেখল না সেটাই প্রশ্ন রয়ে গেল। আজ ডঃ দাস নেই। কিন্তু তাঁর অভিধানের কাজ সেই পান্ডুলিপি নিশ্চয়ই সরকারি কোনও স্থানে হেফাজৎ আছে।আমরা আশাবাদী। আগামী দিনে হয়তো কোনও উদার, মহানুভব, চিন্তাশীল, ডঃ দাসের কাজটা যাতে আলোর মুখ দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করতে পারবেন। ইনি

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট সদস্য, বাংলা আকাদেমির কার্যনির্বাহী সদস্য, সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ও অনেক কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ।এ'র লেখা গ্রন্থসমূহ হ'ল,যথাক্রমে (১)রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয় (২)বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি (৩)চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী (৪) বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ (৫)সমাজঃ প্রগতিঃ রবীন্দ্রনাথ (৬) সম্পাদনা- কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (৭)রবীন্দ্র-কল্পনায় বিজ্ঞানের অধিকার। (৮)বানান বানানোর বন্দরে (৯)১৪০০ সাল ও চলমান রবি (১০)দেশ কাল সাহিত্য (১১)বাঙলা সাহিত্যের আদ্য মধ্য (১২) ব্যাকরণ (তিন খণ্ড) (১৩) সাঁওতালী বাঙলা সম শব্দ অভিধান (১৪)বাছাই প্রবন্ধ এ-ছাড়া রয়েছে নানান্ পত্রিকায় ছড়ানো অগণিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থের জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক দাসকে বাঙ্লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম প্রদত্ত ডি-লিট্ উপাধি দ্বারা (১৯৬২) সম্মানিত করেছেন। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত বৈষ্ণব রস প্রকাশ গ্রন্থটির জন্য 'প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কার' (শ্রেষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থের জন্য ১৯৭৩ সালে),গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৮৪ সালে 'বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার', ১৯৮৭ সালে হওড়া পণ্ডিত সমাজ প্রদত্ত 'সাহিত্য রত্ন' উপাধি, ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক, ১৯৯১ সালে কলকাতা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত 'রবীন্দ্র তত্ত্বচার্য' উপাধি, চোদ্দশ সাল ও চলমান রবি গ্রন্থটির জন্য তিনি 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' পান ১৯৯৪ সালে, ১৯৯৫ সালে পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্মারক পুরস্কার', ১৯৯৮ সালে পান সংস্কৃত কলেজ প্রদত্ত 'রবিতীর্থংকর' উপাধি।

*Initiative By*

*All the content here is the property of Professor Khudiram Das' Family and hence any use of the contents without the prior permission, shall and will be of legal consequences.*

*Designed By*

azways

http://azways.in/

Email: info@professorkhudiraamdas.com

Call: 9831895614

Web: http://professorkhudiramdas.com/